وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণার অনুসারী হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'

(আবূ দাউদ, হা/৪৮৩৩; মিশকাত, হা/৫০১৯)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● ফেব্রুয়ারি ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، جمادى الثاني و رجب ١٤٤٣هـ / فبراير ٢٠٢٢م العدد: ٤، الجزء: ٦٤
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

সাউথ টাউন জামে মাসজিদ, ঢাকা : রাজধানী ঢাকার দক্ষিণে কেরানিগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার সাউথ টাউন আবাসিক প্রকল্পে অবস্থিত, নজরকাড়া স্থাপত্যশৈলীতে ৮ বিঘা জমির উপর ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত, ৬শত মুছল্লী ধারণক্ষমতসম্পন্ন বহু গম্বুজবিশিষ্ট এক তলা মসজিদটি ডেভেলপার মুস্তফা কামাল মইনুদ্দীন নির্মাণ করেন।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৩ || ঈসায়ী ২০২২ || বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ফেব্রুয়ারি	২৮ জুমা ছানি	মঙ্গল	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৫	০৭:০২
০৫ ,,	৩ রজব	শনি	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১২	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:০৫
১০ ,,	৭ ,,	বৃহস্পতি	০৫:১৮	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫১	০৭:০৭
১৫ ,,	১৩ ,,	মঙ্গল	০৫:১৫	০৬:৩১	১২:১২	০৩:২৮	০৫:৫৪	০৭:১০
২০ ,,	১৮ ,,	রবি	০৫:১২	০৬:২৭	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৭	০৭:১২
২৫ ,,	২৩ ,,	শুক্র	০৫:০৮	০৬:২৩	১২:১১	০৩:৩৭	০৬:০০	০৭:১৫

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	০
নরসিংদী	-২	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০
গোপালগঞ্জ	+১	+১	+৩
মাদারীপুর	০	০	+২
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২
শরিয়তপুর	-২	-২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	০	+১	-১
শেরপুর	+২	+৩	০
জামালপুর	+২	+৩	+১
নেত্রকোনা	-১	০	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-৩
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৭	-৮	-৩
রাঙ্গামাটি	-৯	-১০	-৫
বান্দরবান	-৯	-১০	-৫
কুমিল্লা	-৪	-৪	-২
নোয়াখালী	-৪	-৪	-১
লক্ষীপুর	-৩	-৩	০
চাঁদপুর	-২	-২	০
ফেনী	-৫	-৫	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৫	-৫	-৭
সুনামগঞ্জ	-৩	-৩	-৬
মৌলভীবাজার	-৫	-৫	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮
নাটোর	+৬	+৬	+৫
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২
বগুড়া	+৫	+৫	+৩
নওগাঁ	+৬	+৭	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৭	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৬	+৭	+২
দিনাজপুর	+৮	+৯	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৫	+২
কুড়িগ্রাম	+৪	+৫	+১
লালমনিরহাট	+৫	৬	+১
নীলফামারী	+৮	+৮	+৪
পঞ্চগড়	-৩	-৩	-৪
ঠাকুরগাঁও	+৯	+১০	+৫

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	+১	+৪
সাতক্ষীরা	+৪	+৪	+৭
যশোর	+৪	+৪	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৪	+৪	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৮
মাগুরা	+৩	+৩	+৫
নড়াইল	+৩	+৩	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-২	+২
পটুয়াখালী	-১	-২	+২
পিরোজপুর	০	০	+৩
ঝালকাঠি	-১	-১	+৩
ভোলা	-২	-৩	+১
বরগুনা	-১	-১	+৪

৬ষ্ঠ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি-২০২২
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৮
জুমাঃ আখের-রজব
১৪৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক,
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (বিকাল ৪:০০মি.-৫:৩০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধ
  - » হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১৮) ০৩
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
  - » সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া (পর্ব-৫) ০৫
    -হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী
  - » মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ : উম্মাহর পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ০৭
    -ড. মো. কামরুজ্জামান
  - » হক্কের মানদণ্ড (পর্ব-২) ১০
    -মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রহিমাহুল্লাহ
    অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান
  - » মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ১০টি উপায়! (পর্ব-২) ১২
    -আতাউর রহমান
  - » কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান (পর্ব-২) ১৫
    -মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী হাফিযাহুল্লাহ
    অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন
  - » রজব মাসের বিশেষ ছালাত চূড়ান্ত বিদআত ১৮
    -মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
- হারামাইনের মিম্বার থেকে
  - » কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য নিরাপদ আর কাফের মুনাফেক্বদের জন্য আতঙ্ক ২১
    -অনুবাদ : মো. তরিকুল ইসলাম
- তরুণ প্রতিভা
  - » ধূমপান : ধ্বংসের কারণ ২৪
    -আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম
- সাময়িক প্রসঙ্গ
  - » লঞ্চ দুর্ঘটনা : কারণ ও সুপারিশ ২৭
    -জুয়েল রানা
- দিশারী
  - »বন্ধু আমার! পাপ করো না, পাপ হয়ে গেলে তওবা করতে ভুলো না ২৯
    -জাবির হোসেন
- শিক্ষার্থীদের পাতা
  - » মনীষী পরিচিতি-২ : মাওলানা কাযী আতহার মুবারকপূরী রহিমাহুল্লাহ ৩৩
    -আল-ইতিছাম ডেস্ক
- নারীদের পাতা
  - » প্রভুর ঘোষণা কুরআন সুবোধ্য ৩৬
    -তাজরীন নাহার নুসরাত
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩৮
- কবিতা ৩৯
- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪০
- জামি'আহ সংবাদ ৪২
- সওয়াল-জওয়াব ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ই-ফেতনা থেকে সাবধান

ই-ফেতনা তথা ইলেক্ট্রনিক ফেতনা বলতে বুঝায় ইন্টারনেটভিত্তিক ফেতনা। ইন্টারনেট আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ই-ফেতনার উৎপত্তি হয় এবং ইন্টারনেটের বিস্তারের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এই ফেতনা। ইন্টারনেট এক কঠিন পিচ্ছিল পথ। যেখানে ভালো দিকের পাশাপাশি নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্র ধ্বংসকারী বহু উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে ধোঁকা-প্রতারণা ও সময় নষ্ট করার অদৃশ্য হাতিয়ার। এমনকি চরিত্র হননের পাশাপাশি রয়েছে আত্মহননেরও উপাদান। এই ফেতনা পুরো পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে বিশ্ববাসীর দম বন্ধ করে ফেলার উপক্রম হয়েছে। বয়সভেদে আবালবৃদ্ধবনিতা অনলাইনভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যার যেমন ফেইসবুক, ইউটিউব, গুগল ক্রোম, ইমো, ভিগো, লাইকি, টিকটকসহ বিভিন্ন ধরনের গেইমিং সফটওয়্যারে চরমভাবে আসক্ত। ফ্রি ফায়ার গেইম খেলার জন্য ইন্টারনেট ডাটা কেনার টাকা না পাওয়ায় আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে *(যুগান্তর, ২২ মে-২০২১)*। টিকটক বানাতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, এমনকি মৃত্যুও ঘটছে *(যুগান্তর, ২০ ডিসেম্বর-২০২১)*। শিশুরা ইউটিউবে কার্টুনের মধ্যে ডুবে থাকে। এর মধ্যে ঈমান বিধ্বংসী অনেক কার্টুনও রয়েছে। যা কোমলমতি শিশুদের মনের মধ্যে শিরক ও কুফরের বীজ বপন করে। ফেইসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আধিপত্যের কারণে মূর্খতার সাগরে ডুবে যেতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। ২০১৭ সালে বুকার পুরস্কার বিজয়ী ব্রিটিশ লেখক হাওয়ার্ড জ্যাকবসন সতর্ক করে বলেছেন, 'আগামী ২০ বছরের মধ্যে আমরা এমন শিশুদের পাব, যারা পড়তে পারবে না।' ব্রিটিশ এই লেখক জানান, শুধু তরুণ প্রজন্মই নয়, তিনি নিজেও বইয়ের প্রতি আর তেমন মনোযোগ দিতে পারেন না। কারণ তাঁর মনোযোগের একটা বড় অংশও চলে যায় সেই স্ক্রিন টাইমের পেছনে। ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময়ের পরিমাণ ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে কিশোর বয়সীদের মধ্যে একাকিত্বের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বেশি *(সূত্র : এন টিভি, অনলাইন ভার্সন, ২১ আগস্ট-২০১৭)*। আর একাকী থাকা যুবক-তরুণের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক অধঃপতন কোন্ তলানীতে গিয়ে ঠেকবে তা সহজেই অনুমেয়।

ই-ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। বেকার যুবকরা হতাশায় নিমজ্জিত থাকে। কর্ম নেই, ইনকাম নেই, জীবনের শ্রী নেই, মনে শান্তি নেই, পরিবারে মর্যাদার স্থান নেই এমন যুবকরা ইন্টারনেটে বুঁদ হয়ে থাকে। একাকিত্ব দূর করা ও মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য ডুবে যায় ইন্টারনেটের জগতে। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়। একের পর সাইট চেঞ্জ করে নিষিদ্ধ জগতে হারিয়ে যায়। সময়ের কোনো হিসাব থাকে না। সারাক্ষণ চোখ থাকে মোবাইলের পর্দায়। ফলে মানসিক যন্ত্রণা লাঘব হওয়ার পরিবর্তে আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো কাজ খোঁজার আগ্রহ থাকে না। কাজ করতে মন চায় না। মানুষের সাথে মিশতে ইচ্ছা হয় না। মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকে। ফলে বেকারত্ব ও হতাশা আরো বাড়তে থাকে। পাশাপাশি অনেক সোস্যাল মিডিয়াকর্মী অনলাইন জগতকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে ফেলেছে। যার কারণে ভাইরাল কনটেন্ট পেলেই তা লুফে নিয়ে ফলাও করে প্রচার করা শুরু করে। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের কথা চিন্তাও করে না। অথচ বিনা তদন্তে বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে কথা বলাটাও অন্যায় *(বুখারী, হা/২৬৭১)*। আর বিশ্বাস করা তো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(আল হুজুরাত, ৪৯/০৬)*। এমনকি নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের উপরেও নিউজ করতে তাদের বিবেকে বাধা দেয় না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! ...তোমরা কারো গোপন বিষয় সন্ধান করো না' *(আল হুজুরাত, ৪৯/১২)*। এর কারণ- অর্থই তাদের মূল উপজীব্য। সম্পদই তাদের একমাত্র পূজ্য। যেকোনো উপায়ে যেকোনো পথে পয়সা হাতে আসাই তাদের মূল লক্ষ্য।

তাছাড়া ইন্টারনেট আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের পরিচিতির গণ্ডি ছিল সীমিত। যে বা যারা তাদের চিনত, তারা জেনে-বুঝেই তাদের মূল্যায়ন করত। কিন্তু ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন মানুষের পরিচিতির ভৌগলিক কোনো সীমারেখা নেই। ফেইসবুক, ইউটিউবের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। একজন প্রকৃত জ্ঞানী তার জ্ঞানকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারছে। ঘরে বসেই মানুষ জ্ঞান আহরণ করতে পারছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো দিক। কিন্তু বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে দুনিয়ালোভী, স্বার্থপর, প্রবৃত্তিপূজারী কিছু মানুষ। জ্ঞানের জগতে যারা মিসকীন তারাই বনে যাচ্ছে সেলিব্রিটি। আত্মপ্রচারের তীব্র লালসার বশবর্তী জ্ঞানহীন এ লোকগুলো নিজেদের মঞ্চস্থ করছে দ্বীন প্রচারের ময়দানে। আর প্রকৃত জ্ঞানী, দুনিয়াত্যাগী, আল্লাহভীরু ও সৎ লোকেরা থেকে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এর পিছনে আম-জনতার যে কোনো দোষ নেই, তা বলা যাবে না। অনলাইনে সুপরিচিত ব্যক্তি ছাড়া ওয়ায-মাহফিল নয়। বক্তব্যে ইলমের খোরাক কিছু নাই-বা থাক কথা বলার কৌশলই হয় বক্তা নির্বাচনের মূল বিষয়। জনগণ এই মানসিকতা থেকে বের হতে না পারলে না অর্বাচীন লোকদের সেলিব্রিটি বনে যাওয়ার উদগ্র বাসনা বন্ধ হবে না কখনও।

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৫৬ নং পৃষ্ঠায়)

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১৮)

মুযদালিফায় রাত্রিযাপন : সূর্য ভালোভাবে অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হবে। অতঃপর ধীরস্থির, শান্ত ও নম্রভাবে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিতে হবে। মুযদালিফায় পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত জামাআতবদ্ধভাবে ক্বছর করতে হবে। মাগরিব ও এশায় কোনো সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে না। ৯ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর আরাফার ময়দান হতে তালবিয়া পাঠ, তাকবীর পাঠ এবং তওবা ও ইস্তিগফার করতে করতে ধীরে ধীরে প্রায় ৯ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা ত্যাগ করা যাবে না। যদি ফিরে না আসে তাহলে কাফফারা দম (পশু জবেহ) ওয়াজিব হবে। তারপর মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার ছালাত একসাথে আদায় করতে হবে। মাগরিব তিন রাকআত এবং এশা দুই রাকআত ক্বছর করতে হবে। দুই ছালাতের মাঝে এবং এশার ছালাতের পর আর কোনো ছালাত নেই। এরপর রাসূল ﷺ ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন। এতে বুঝা যায়, তিনি এ রাতে বিতর বা তাহাজ্জুদ পড়েননি। কোনো কারণে মাগরিব ও এশার মাঝে ব্যবধান ঘটলে কোনো সমস্যা নেই। মুযদালিফায় ঘুম থেকে উঠে আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে দীর্ঘ সময় কিবলামুখী হয়ে দু'আ ও ইস্তিগফার করতে হবে। সম্ভব হলে মাশআরুল হারাম মসজিদে ছালাত আদায় করতে হবে। তারপর ভালোভাবে আকাশ ফর্সা হলে সূর্যোদয়ের আগেই মিনার দিকে রওয়ানা দিতে হবে। তবে দুর্বলদের এবং মহিলাদের নিয়ে অর্ধরাত্রিতেই মিনা যাওয়া যায়। অর্ধরাত্রির পূর্বে মুযদালিফা ত্যাগ করা যাবে না। অর্ধরাত্রির আগে মুযদালিফা ত্যাগ করলে কাফফারা দম ওয়াজিব হবে। মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়ার সময় সাতটি ছোট পাথর কুড়িয়ে নিতে হবে। সকালে মিনায় গিয়ে বড় জামরায় মারতে হবে। এ সময় বিশেষ ধরনের কঙ্কর কুড়ানোর জন্য টর্চ লাইট জ্বালিয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া বিদআতী আক্বীদা মাত্র।

মিনায় ফিরে যাওয়া : ১০ই যিলহজ্জ ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফা থেকে তালবিয়া পাঠ করা অবস্থায় রওয়ানা হয়ে মুযদালিফার শেষপ্রান্ত ও মিনার সীমান্ত এলাকায় মুহাসসির উপত্যকায় একটু জোরে চলতে হবে। তারপর প্রায় ৫ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর প্রথমে 'জামরাতুল আকাবা' যা প্রথম দুটি জামরার পরে রয়েছে এবং মক্কার দিকে রয়েছে, সেই বড় জামরাকে লক্ষ্য করে মক্কাকে বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রেখে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ সময় তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে এবং ইহরাম খুলে ফেলবে। যদিও মাথা মুণ্ডন এবং কুরবানী বাকি থাকে। কোনো কারণে সকালে পাথর নিক্ষেপ করতে না পারলে বিকালে নিক্ষেপ করবে। আর যখন বিকালে ত্বাওয়াফ শেষ হবে, তখন হবে পূর্ণ হালাল। প্রথম হালালের পর স্ত্রী মিলন বৈধ হবে না। তবে দ্বিতীয় হালালের পর স্ত্রী মিলন বৈধ হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّ أُسَامَةَ ؓ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

ইবনু আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামা ইবনু যায়েদ ؓ আরাফার ময়দান হতে মুযদালিফা পর্যন্ত ফিরে আসার সময় নবী করীম ﷺ-এর পেছনে বসেছিলেন। তারপর তিনি ﷺ মুযদালিফা হতে মিনায় আসা পর্যন্ত (আমার বড় ভাই) ফযল ইবনু আব্বাসকেও তার পেছনে বসিয়েছিলেন। তারা উভয়ে বলেছেন, নবী করীম ﷺ জামারাতুল আক্বাবায় কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছিলেন।[১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মাগরিব ও এশার ছালাত মুযদালিফায় একত্রে আদায় করেছেন। প্রত্যেক ছালাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইক্বামত দিয়েছেন এবং এই দুই ছালাতের মাঝে কোনো নফল ছালাত আদায় করেননি এবং পরেও আদায় করেননি।[২]

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يومئِذٍ قبلَ ميقاتها.

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৫৪৪; মিশকাত, হা/২৬০৬।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৭৩; নাসাঈ, হা/৩০২৮; মিশকাত, হা/২৬০৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কখনো মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করা ছাড়া আর অন্য কোনো ছালাত একত্রে আদায় করতে দেখিনি। আর সেদিনই তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের ছালাতও (কিছু সময়) আগে আদায় করেছিলেন।[৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের পরিবারের যে দুর্বলদের (শিশু ও মহিলা) মুযদালিফার রাতে সময়ের আগেই (মিনায়) পাঠিয়েছিলেন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।[৪]

عَن الفضلِ بن عبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

ফযল ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উটের পেছনে বসা ছিলেন। তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফার সন্ধ্যায় ও মুযদালিফায় ভোর বেলায় লোকেদের উদ্দেশে বলেছেন, তোমরা (অবশ্যই) প্রশান্তির সাথে চলবে। তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও নিজের উষ্ট্রীকে মিনার অন্তর্গত মুহাসসির নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত সংযত রেখেছিলেন। এখানে তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তোমরা আঙুল দিয়ে ধরা যায় এমন ছোট পাথর জামরাতে নিক্ষেপের জন্য নাও’। ফযল বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামরায় পাথর মারা পর্যন্ত সব সময় তালবিয়া পড়ছিলেন।[৫]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَقَالَ لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا.

জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুযদালিফা হতে প্রশান্তির সাথে ধীরস্থিরভাবে রওয়ানা হলেন, লোকজনকেও শান্তশিষ্টভাবে রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। তবে মুহাসসির উপত্যকায় পৌঁছার পর উটকে কিছুটা দৌড়ালেন এবং তাদের জামরায় আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করার মতো পাথর মারতে নির্দেশ দিলেন। এমন সময় তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সম্ভবত এ বছরের পর আমি আর তোমাদের দেখতে পাব না।[৬]

প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ডান হাত উঁচু করে বলতে হবে ‘আল্লাহু আকবার’। এভাবে সাত বার তাকবীর দিয়ে সাতটি কঙ্কর মারতে হবে। এ তাকবীরধ্বনি শয়তানের বিরুদ্ধে মুমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহ যে সবচেয়ে বড়, তার ঘোষণা। কঙ্কর হাউজের মধ্যে পড়লেই হবে। পিলারের গায়ে লাগতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। অতএব সারকথা হলো, মিনায় পৌঁছে দুপুরের আগেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর কুরবানী করতে হবে। অতঃপর পুরুষেরা মাথা ন্যাড়া করবে অথবা মাথার চুল ছোট করবে। আর মহিলারা চুলের অগ্রভাগ সামান্য কেটে ফেলবে। তারপর ইহরাম খুলে স্ত্রী মিলন ছাড়া অন্য সবকিছু হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরামের পূর্বে হালাল ছিল। তবে ত্বাওয়াফে ইফাযা করা হলে স্ত্রী মিলনও হালাল হয়ে যাবে। ‘ত্বাওয়াফে ইফাযা’-কে ‘ত্বাওয়াফে যিয়ারা’-ও বলা হয়। ত্বাওয়াফে ইফাযা একটি রুকন। যিলহজ্জের ১০ তারিখেই করতে হবে। না হলে আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে করতে হবে। সম্ভব না হলে দম দিতে হবে।

মিনায় পাঁচটি কাজ : ১০ই যিলহজ্জ সকালে মুযদালিফা থেকে মিনায় পৌঁছে মোট পাঁচটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। সেগুলো হলো : (১) বড় জামরায় কঙ্কর মারা, (২) কুরবানী করা, (৩) মাথা ন্যাড়া করা অথবা চুল ছোট করা, (৪) মক্কায় গিয়ে ত্বাওয়াফে ইফাযা করা ও (৫) সাঈ করা।

তবে এ কাজগুলোর কোনোটা আগে-পিছে হয়ে গেলে তাতে কোনো দোষ নেই। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরবানীর দিন চাশতের সময় বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন। পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করেন।[৭]

(চলবে)

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১২৮৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪১৩৭; মিশকাত, হা/২৬০৮।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৭৮; মিশকাত, হা/২৬০৯।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১২৮২; মিশকাত, হা/২৬১০।
৬. তিরমিযী, হা/৮৮৬, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৬১১।
৭. ছহীহ বুখারী, ৬/৪১৮, ‘পাথর নিক্ষেপ’ পরিচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৯৯; মিশকাত, হা/২৬২০।

সূরা আন-নাবা : মানবজাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(নভেম্বর'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৫)

(৪) মহান আল্লাহ দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করেছেন : রাতে ও দিনে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে হবে। মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে আসা আবার বড় হওয়া অথবা শিশু থাকা অবস্থা অথবা বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ- এসবই মহান আল্লাহর নিদর্শন। মানুষ দুনিয়ায় আসছে আবার চলে যাচ্ছে। কেউ আসছে আবার কেউ মৃত্যুবরণ করছে। এভাবেই দিন আসছে, রাত চলে যাচ্ছে আর রাত আসছে, দিন চলে যাচ্ছে। এক যুগ চলে যাচ্ছে আর এক যুগ আসছে। এসবের পরিবর্তন মানুষকে স্মরণ করাচ্ছে মৃত্যু, আল্লাহর একত্ব, সকল ইবাদত তার জন্যই করা, তার হুকুমে দিন-রাতের পরিবর্তন ও তারই আদেশে সবকিছু চলমান হওয়ার কথা। বিধায় চোখ-কান খুলে নিজের কল্যাণের দিকে অগ্রসর হতে হবে। রাত ও দিনের পরিবর্তনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামের মাধ্যম। আর রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের জন্য উপযোগী' *(আন-নাবা, ৭৮/৯-১১)*। মানবজাতি দিনের বেলায় কাজ-কর্মে ব্যস্ত থেকে ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন তার আরাম-আয়েশের প্রয়োজন হয়। তাই তিনি রাতে নিদ্রার ব্যবস্থা করেছেন যাতে মানুষ ঘুমিয়ে তার ক্লান্তি দূর করতে পারে। তিনি রাত্রিকে অন্ধকার করেছেন যাতে তারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারে, আরাম-আয়েশ করতে পারে। আবার দিনের বেলায় সূর্য দিয়েছেন যাতে তাদের কাজ-কর্ম করতে সুবিধা হয়। যমীনে ফসল ফলানোর জন্য তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এসবই মানবজাতির কল্যাণে মহান আল্লাহর দান। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন স্রষ্টা রয়েছে। তারই জন্য সকল ইবাদত করতে হবে, তার কাছেই সকল চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি বলো, হে রাজ্যধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা, রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা, রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, আপনারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। আপনি রজনীকে দিবসের ভিতরে প্রবেশ করান এবং দিবসকে রজনীর ভিতর প্রবেশ করান এবং মৃত হতে জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত হতে মৃত্যুকে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন *(আলে ইমরান, ৩/২৬-২৭)*। কল্যাণ-অকল্যাণ, সম্মান দেওয়া ও লাঞ্ছিত করা, রাজত্ব দেওয়া ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া ও দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসাতে কারো কোনো ক্ষমতা নেই, আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া। আবার কোনো সময় দিন বড় হয়, রাত ছোট হয়। এর বিপরীতে শীতকালে রাত বড় হয় আর দিন ছোট হয়। এসবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। আর স্বামী-স্ত্রীর শুক্রকীট ও ডিম্বানু থেকে মহান আল্লাহ সন্তানসন্ততি সৃষ্টি করেন। এ শুক্রবিন্দুকেই মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এভাবেই মহান আল্লাহ শিশুদের জন্ম দান করেন।[১]

আয়াতগুলো থেকে তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ বুঝা যায়। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, হায়াতদাতা, মৃত্যুদাতা, পালনকর্তা, রাজত্ব দেওয়ার মালিক, নেওয়ার মালিক, রাতকে রাত, দিনকে দিন করার মালিক, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। বিধায় তারই জন্য সকল ইবাদত-বন্দিগী করতে হবে, উত্তম নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তার অসীলা তালাশ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী তুমি বলো! কে তোমাদের আসমান ও যমীন হতে রিযিক্ব পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর কে জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর কে সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। অতএব তুমি বলো, তবে কেন তোমরা ভয় কর না? *(ইউনুস, ১০/৩১)*। আয়াতটি থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, মক্কার কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করত, তাওহীদে রুবূবিয়্যার প্রতি বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে শরীক করত, মূর্তিপূজা করত।[২]

আর কুফফারে কুরাইশ ও মুশরিকগণ বিপদে পড়লে খালেছ অন্তরে আল্লাহকেই ডাকত। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘমালার মতো, তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহকে ডাকত। কিন্তু যখন তিনি তাদের উদ্ধার করে

* পি.এইচ.ডি গবেষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া।

১. তাফসীর আত-তবারী, ৬/৩০৫।
২. ইবনু কাছীর, ৪/২৬৬।

স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। আর বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে *(লোক্বমান, ৩১/৩২)*। বর্তমানে নামধারী মুসলিম বিপদে পড়লে পীর সাহেবকে ডাকে। মুরীদরা সুখ-দুখ, ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায় পীরের নিকট প্রার্থনা করে। কিন্তু মক্কার কাফেররা বিপদে পড়লে খালেছ অন্তরে আল্লাহকে ডাকত। আর ভালো থাকলে মূর্তিপূজা করত। এটাই হলো বর্তমান কবর পূজারী এবং কুফফারে কুরাইশদের মাঝে পার্থক্য। সুতরাং মুসলিমজাতির উচিত হবে, কবরপূজা ছেড়ে শুধু আল্লাহর নিকটেই জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা, তাঁর উপর ভরসা করা ও তাকে ভয় করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃত্যুরও আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যের পর তাকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে' *(আর-রূম, ৩০/১৯)*। তিনি আরো বলেন, আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করা। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন ও তার দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে। তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী স্থিতিশীল। অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে উঠবার জন্যে একবার আহ্বান করবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। সবকিছু তারই অনুগত' *(আর-রূম, ৩০/২৩-২৬)*।

(৫) আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ : মহান আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে মানুষ শস্য-ফসল বপন করতে পারে এবং রূযী-রোযগার করতে পারে। জমি চাষাবাদ করার জন্য মহান আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পানি ছাড়া মানবজীবন অচল। অনুরূপভাবে পশু-পাখি, জীব-জন্তুসহ সকলেরই পানির প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন একমাত্র মানুষেরই কল্যাণের জন্য। সেই অনুগ্রহের অন্যতম হলো বৃষ্টি বর্ষণ। মহান আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত। তিনি বলেন, ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ 'দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নত' *(ত্ব-হা, ২০/৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ - أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾ 'তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। অথবা তোমার কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কীরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী' *(আল-মুলক, ৬৭/১৬-১৭)*। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا - وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا - وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا - لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا - وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ 'আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর সুদৃঢ় সাত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি একটি অতিউজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য)। আর বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি, এর দ্বারা আমি শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি এবং আরো উৎপন্ন করেছি নিবিড় ও ঘন বাগানসমূহ *(আন-নাবা, ৭৮/১২-১৬)*। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি বৃষ্টি দিয়ে মানুষের বহু কল্যাণ সাধিত করেন। কিন্তু মানুষ সে নেয়ামতকে নিয়ে একবারও চিন্তা করে না। যখন বৃষ্টি হয় না তখনই এর মর্যাদা বুঝা যায়। যখন মানুষ খেতে বসে গলায় ভাত বা অন্য কিছু আটকে যায় বা পিপাসা লাগে তখনই বুঝা যায় যে, মানুষের জীবনে পানির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? সুতরাং হে মানবজাতি! একবার চিন্তা করো, হতে পারে এ চিন্তাই তোমার হেদায়াত লাভের কারণ হবে। যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাকেও সৃষ্টি করেছেন, এটি চিন্তা করো।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্যে ফলমূল উৎপাদন করেন, নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর হুকুমে সেগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছো তা হতে, তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করলে এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালেম, অকৃতজ্ঞ, *(ইবরাহীম, ১৪/৩২-৩৪)*। মানুষ আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আঙুর, কলা, আনারস, পেঁপে, মাছ, গোশত, ডিম, ভাত, রুটিসহ আরো অনেক খাবার খায়। এগুলো কোথায় পায়? সবই আল্লাহর নেয়ামত। বিভিন্ন ধরনের সবজি খায় এই সবগুলো একমাত্র মহান আল্লাহ বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন করেন, কিন্তু মানুষ তা একবারও চিন্তা করে না। পানি ছাড়া কোনোকিছুই উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। বিধায় আল্লাহর নেয়ামত ভক্ষণ করে যদি তাঁর ইবাদত না কর, তাঁকে না মান, তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

(চলবে)

মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ : উম্মাহর পাওয়া শ্রেষ্ঠ উপহার

-ড. মো. কামরুজ্জামান*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহানবী ﷺ-এর অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় এক মডেল। তাঁর চিন্তাগত দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল বিশ্বজনীন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রত্যাদিষ্ট আদর্শের অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার এক অনন্য নির্মাতা; ছিলেন মানবীয় ঐক্যের রূপকার। তিনি বিশ্ববাসীর এক নিদারুণ ক্রান্তিকালে জন্ম নিয়েছিলেন। সময়টি ছিল মানবজাতির জন্য এক বড় দুঃসময়। সমাজে বিরাজ করছিল তখন জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ এবং দাঙ্গা। অবিচার, অনাচার, কুসংস্কার আর ব্যভিচার ছিল সমাজের নিত্যদিনের ঘটনা। সমাজে চলছিল তখন সংঘাত ও বৈষম্যের দৌরাত্ম্য। এমনই এক ক্রান্তিকালে আগমন ঘটে মহানবীর ﷺ। তার আগমনের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে সততা, সহনশীলতা ও মানবতার। সমাজে বিচ্ছুরণ হতে থাকে সত্য-ন্যায়ের আলোকচ্ছটা। পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত আরবে প্রকাশ পেতে থাকে উন্নত মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদা। তিনি সাদা-কালোর বৈষম্য দূর করেন। তিনি উঁচু-নিচুর ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে দেন। তাঁর প্রচারিত জ্ঞানের আলোয় দূরীভূত হতে থাকে ব্যবধানের সকল দেয়াল। তার মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী শুধু কথার মধ্যেই সীমিত ছিল না। তিনি শুধু ভাববাদী কথাই বলতেন না; সমাজ জীবনে সফল বাস্তবায়ন ছিল তাঁর প্রচারিত আদর্শের স্বার্থকতা। তার অদম্য প্রচেষ্টায় স্বয়ং ইবলীস বারবার আর্তনাদ করে মূর্ছা গিয়েছিল। ইবলীসের এ মূর্ছা যাওয়াটা এখনও বর্তমান আছে। মহানবী ﷺ-এর প্রচারিত আদর্শ ছিল পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মৌলিক ও বাস্তব নির্দেশনা। Ideals of Islam গ্রন্থে একজন অমুসলিম লেখিকা এ কথাটা নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন, 'ন্যায়বিচারবোধ ইসলামের এক অনুপম আদর্শ। কুরআন অধ্যয়ন করলে জীবন দর্শনের অসংখ্য গতিশীল নীতিকথার সন্ধান পাওয়া যায়। যা শুধু ভাববাদী অর্থে প্রকাশিত হয়নি। বরং এ নীতি কথাগুলো মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব এক নির্দেশনা'। এ. জে. টয়নবি লিখেছেন, 'মহানবী ﷺ সংকীর্ণ গোত্র এবং জাতিপ্রীতির বিলোপ সাধন করেছেন। বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র গোত্রপ্রীতি থেকে বাঁচতে মহানবীর বাস্তব আদর্শ গ্রহণ এবং এর প্রচার জরুরী'। 'জর্জ বার্নার্ড শ তার The genuine Islam গ্রন্থে বলেছেন, 'মহানবীর ﷺ প্রচারিত আদর্শের মধ্যে রয়েছে এক সম্মোহনী শক্তি। সে কারণে আমি তার আদর্শকে অন্তর থেকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করি। আর তার এ আদর্শ এমনই যুগশ্রেষ্ঠ যে, পরিবর্তিত সকল যুগেই সেটি সমভাবে খাপ খাওয়ানো সম্ভব। আর এ আদর্শ সকল কালে, সকল যুগে ও সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও অনুসরণীয়'। মূলত মহানবী ﷺ ছিলেন মানবমুক্তির মহান দিশারী। তাঁর কাছে প্রেরিত রিসালাত ছিল মানবতার মুক্তির এক জীবন্ত নির্দেশনা। ছিল এক বাস্তব প্রেসক্রিপশন। আর সেটা দিয়েই তিনি বঞ্চিত মানবতাকে মুক্ত করেছিলেন। আর এটা ছিল এমন এক প্রেসক্রিপশন, যা দিয়ে সকল কালের যুলুম এবং বৈষম্যের মোকাবেলা করা যায়। এর মাধ্যমেই দুর্বলের উপর পরিচালিত শোষণের মূলোৎপাটন করা যায়। দূরীভূত করা যায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল অনাচার ও নৈরাজ্য। ফিরিয়ে দেওয়া যায় অধিকারবঞ্চিতদের সকল অধিকার। বর্তমান সময়কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়ে থাকে। তাঁর প্রণীত প্রেসক্রিপশনের যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব। তিনি ﷺ বলেছেন, 'ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না সময় নিকটতর হবে। বছর হবে মাসের ন্যায়, মাস হবে সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহ হবে দিনের ন্যায় আর দিন হবে মিনিটের ন্যায়'।[১] নবীজির এ প্রেসক্রিপশন বিজ্ঞানময় যুগের এক অমূল্য নির্দেশনা। এ নির্দেশনা সময়ানুবর্তিতারও বৃহৎ এক দিক। এ নির্দেশনার অনুশীলন বিজ্ঞানের ইতিবাচক দিকগুলোকে মানবজাতির সামনে সাবলিলভাবে পেশ করে। মহানবী ﷺ প্রণীত শ্রমনীতি অনুসরণের মাধ্যমে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরি ফিরে পেতে পারে। অব্যাহত শ্রমিক অসন্তোষ দূর হতে পারে তাঁর একটি মাত্র বাক্য অনুসরণের মাধ্যমে। 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. তিরমিযী, হা/২৩৩২, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৫৪৪৮।

www.al-itisam.com

আগে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করো’।[২] বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত। ব্যর্থ এ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অবসান হতে পারে কেবল তাঁর প্রণীত অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এ ব্যবস্থার যথাযথ অনুসরণে শিল্প-কলকারখানায় সুষ্ঠু উদ্ভাবনের পথ তৈরি হতে সক্ষম। এক কথায়, মহানবী ﷺ-এর জীবনী পাঠ করে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত; ছিলেন সৃষ্টির সেরা এক উপহার। তাই মানবসভ্যতার সকল স্তরে তাঁর মহত্ত্ব ও গুণের ছাপ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সূর্যের কাজ যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করা। ঠিক তেমনি নবীগণ মানুষের মন, মগজ, তার চিন্তা ও আচরণকে আলোকিত করে গেছেন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ কোনো অপূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার নাম নয়। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি দিয়ে পরিপূর্ণ বিধানের নাম ইসলাম হতে পারে না। ইসলামে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি রয়েছে; রয়েছে নানা সামাজিকতা। রয়েছে দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিধানের ব্যবহারিক ফর্মূলা। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পনীতি ও অর্থনীতির সফল এক দ্রষ্টার নাম হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর প্রণীত এ বিধানে আরো রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের প্র্যাকটিক্যাল দৃষ্টান্ত। রয়েছে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, সামরিক বিভাগ এবং এতদসংক্রান্ত আইনকানুন। আর যাবতীয় এসব আইনকানুনের প্রবর্তক হলেন মহানবী ﷺ। মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থায় তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম এবং একমাত্র সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং রাজনীতিবিদ। যদিও বর্তমানের মতো তার কোনো নিয়মিত বাহিনী ছিল না। ছিল না নিয়মিত রাজনৈতিক কোনো কর্মসূচি। অথচ তিনি এমন একটি রাজ্যের পত্তন ঘটান, যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস বিন্যাসে প্রথম স্থানটি দখল করে আছে। আধুনিক যুগেও সে রাষ্ট্রটি বিরল দৃষ্টান্তের সাক্ষী হয়ে আছে। দুনিয়াতে অগণিত নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে। তার মধ্যে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ হলেন শেষ নবী। আর তাঁর কাছে নাযিলকৃত পয়গামই শেষ পয়গাম। এ পয়গামের ভিত্তিতেই তিনি একটি জাতি-রাষ্ট্রকে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। মাত্র ২৩ বছরে এ পয়গাম ৮ লাখ বর্গমাইল জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ২৩ বছরের ১৩টি বছর তাকে শুধু আঘাতই সহ্য করতে হয়েছিল। প্রিয় জন্মভূমি মক্কাবাসীর অতি প্রিয় আল-আমীন ছিলেন তিনি। জীবনে একটা মিথ্যা কথাও বলেননি, এক মুহূর্তের জন্যও কাউকে ফাঁকি দেননি, কোনো একজন শত্রুর ক্ষতি চাননি। জীবনে কারো খেয়ানত করেননি। এমন এ ব্যক্তিটিকে আরব নেতৃবৃন্দ খুন করতে এসেছিল। অথচ ওই শত্রু-নেতৃবৃন্দের সম্পদ তাঁরই কাছে আমানত হিসেবে গচ্ছিত ছিল। এসব ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পদ রক্ষায় তিনি আলী رضي الله عنه-কে আমানতদার নিযুক্ত করেছিলেন! হায়রে আদর্শবান নেতা! হায়রে আধুনিক যুগের নেতৃত্ব! দীর্ঘ ১৩টি বছর মহানবী ﷺ শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন সহ্য করেছিলেন। ৬২২ সালে তিনি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে অবস্থান করেছিলেন। মদীনায় তিনি মাত্র ১০ বছর সময় অতিবাহিত করেছিলেন। ২৩ বছরের মধ্যে মাত্র ১০ বছর আরবে ইসলাম প্রচার করতে সময় পেয়েছিলেন। এ এক দশকে তিনি ২৭টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। বিভিন্ন সন্ধি, চুক্তি ও কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন। নিজ গৃহে ৯ জন স্ত্রীকে খুশী রেখেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বিশাল একটি রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মধ্যযুগে বাংলাদেশের মতো ১৬টি রাজ্যের শাসক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এ রাজ্যের পরিধি ছিল ৮ লাখ বর্গমাইল। ৬৩২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ২০ বছরের মধ্যেই তাঁর ছাহাবীগণ رضي الله عنهم রাজ্যের সীমানা ২৬ লাখ বর্গমাইলে বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। আর এটা সক্ষম হয়েছিল শুধু মুহাম্মাদ ﷺ-এর রেখে যাওয়া আদর্শ চর্চা ও তা অনুশীলনের মাধ্যমে। অথচ আধুনিক যুগের চরম উন্নতির এই সময়ে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আমরা বারবার হোঁচট খাচ্ছি।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় জননিরাপত্তার শতভাগ গ্যারান্টি ছিল। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সমভাবে নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত ছিল। অথচ তাঁর আগমনের সময়কালে ব্যবসায়ী একটি কাফেলাও নিরাপদ ছিল না। লোকলস্কর সাথে নিয়েও এক শহর থেকে অন্য শহরে কোনো কাফেলা নিরাপদে পৌঁছতে পারত না। তস্করের দল উক্ত কাফেলার উপরে সম্মিলিত হামলা চালাতো। ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীপণ্য ও তাদের জীবন দস্যুতা ও ছিনতাইয়ের কবলে পড়ত। বাধা ও প্রতিবাদ করলে হত্যার ঘটনা ঘটত। অথচ এই তস্করের দলের প্রতিটি সদস্য নবীজি ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিল। তারা সবাই একটিমাত্র কালেমা আয়ত্ত করে ফেলল। আর সে কালেমাটির নাম হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ’। এ একটি বাক্য সেই তস্করের দলকে নিরাপত্তাকর্মীতে রূপান্তর করল। আরবের সমাজ শান্তিময় নগরীতে পরিণত হলো। রাতের অন্ধকারে শুধু কোনো ব্যবসায়ী কাফেলাই নিরাপদ হলো না, বরং একাকী কোনো

২. ইবনু মাজাহ, হা/২৪৪৩, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৯৮৭।

যুবতী নারীও যদি সোনা বোঝাই ঝাঁকা নিয়ে বের হতো। রাতের অন্ধকারে সুদূর ইয়ামান থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত যদি সে যাত্রা করত, তবুও তাকে ডিস্টার্ব তো দূরের কথা, কেউ তাকে তাকিয়েও দেখত না।

উক্ত কালেমাটি রপ্ত করে এক একজন ডাকাত হয়ে পড়ল রাষ্ট্রের এক একজন অতন্দ্র প্রহরী। শুধু মুখে নয়, বরং প্রতিটি কাজে তারা দেশপ্রেমের উদাহরণ পেশ করল। তাদের প্রত্যেকেই প্রতিটি নারীর সম্মান রক্ষার অতন্দ্র পাহারাদারে পরিণত হলো। অথচ এর মাত্র ১৩ বছর পূর্বেও তারা কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। নারীদেরকে তারা ভোগ্যপণ্য মনে করত। সামাজিক ন্যূনতম কোনো সম্মান তাদের ছিল না। নবীজি ﷺ-এর একটিমাত্র আওয়াজে একটি বর্বর জাতির ইতিহাস পালটে গেল। এ এক আজব ব্যাপার! কিন্তু আজব হলেও এটাই সঠিক। এটাই সত্য ইতিহাস। এটা কোনো কল্পকাহিনী নয়। এটা পৃথিবীর একমাত্র ইতিহাস, যার দ্রষ্টা হলেন মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া এক নিঃস্ব বালক। নাম তাঁর মুহাম্মাদ ﷺ।

নবীজির আগমনের সময়টি ছিল নির্লজ্জ দলাদলি, মারামারি ও রক্তারক্তিতে ভরপুর। বর্ণ, ভাষা ও আভিজাত্য ছিল দুর্লঙ্ঘনীয়। সমাজ ছিল পশুত্বের নিকষকালো অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর মানুষ ছিল শান্তিহারা, অধিকারহারা, নিষ্পেষিত ও নিপীড়িত। সমস্ত মানুষের জন্য নবীজির আগমন ছিল রহমত, নেয়ামত ও শান্তির সওগাতস্বরূপ। প্রত্যাগত এ সওগতের মাধ্যমে দূর হয়ে গেল শোষণ ও নিষ্পেষণ। তার আগমনে সমাজে প্রবাহিত হলো শান্তির সুশীতল আবহ। দূর হয়ে গেল আভিজাত্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। মানুষে মানুষে তৈরি হলো সাম্য, ভ্রাতৃত্ব আর মৈত্রীর বন্ধন। এ উপলক্ষ্যে তাঁর প্রদত্ত বাণী উল্লেখ করার মতো। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, ‘অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের কোনো প্রাধান্য নাই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো তাক্বওয়া’।[৩] বর্তমান পৃথিবী এক ক্ষয়িষ্ণুর মারাত্মক তলানিতে এসে পৌঁছেছে। মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। মহানবী ﷺ প্রণীত সকল আদর্শ আজ সর্বত্রই উপেক্ষিত। সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ; বিশাল এক পৃথিবী। বিশাল এ পৃথিবীর শাসকেরা তাঁর আদর্শকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। বিশ্বনেতৃবৃন্দের সকলেই সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ও প্রবক্তা। মুখে তারা নীতিকথা বললেও বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনগণ তাদেরকে ধান্ধাবাজ ও যুদ্ধবাজ হিসেবেই জানে। তারা গণতন্ত্রের আড়ালে মূলত এক একজন ক্ষমতালোভী ও অস্ত্রব্যবসায়ী। ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যনীতি তাদের ক্ষমতালোভেরই বহিঃপ্রকাশ। বিশ্বকে বাঁচাতে তাই মহানবী ﷺ-এর আদর্শের বিকল্প নেই। সকল তন্ত্র-মন্ত্র পরিহার করে সকলকে ফিরে আসতে হবে নবী ﷺ প্রবর্তিত নীতির দিকে। মাযলূম জনতার আহাজারিতে বর্তমান দুনিয়া ভারী হয়ে উঠেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা প্রায় ৯ কোটি লোককে হত্যা করেছে। ইরাকে তারা নিরীহ-নিরপরাধ ১ কোটি ২০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। ২০ বছরের যুদ্ধে আফগানিস্তানকে তারা ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। বসনিয়া ও কসোভোতে তারা সংখ্যালঘুদেরকে হত্যা করেছে। চেচনিয়ার ৫ লাখ সংখ্যালঘুদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দিয়েছে। চীনের উইঘুরে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাকে তারা বিলোপ সাধন করেছে। আর মায়ানমার দেখিয়ে দিল যে, তাদের দেশে সংখ্যালঘুদের কোনো জায়গা নেই। এমতাবস্থায় বিশ্বের দিকে দিকে মাযলূমদের আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। তারা ফরীয়াদ করে বলছে, ‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে দিন! কারণ জনপদের (শাসকগণ) অত্যাচারী সম্প্রদায়। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন নেতা প্রেরণ করুন, যিনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী হবেন’ *(আন-নিসা, ৪/৭৫)*। সেকালের পাপাচার আর একালের পাপাচার একইভাবে চলমান রয়েছে; পার্থক্য রয়েছে শুধু সময় ও পরিভাষায়। সেকালের আল্লাহহীনতা বর্তমানকালের সেক্যুলারিজম নামের আধুনিক শব্দে রূপ নিয়েছে। সেকালের ধর্মবিমুখতা একালের সেকেলে মানসিকতায় রূপ নিয়েছে। প্রচীনকালের অত্যাচার-নির্যাতন একালে গণতন্ত্রহীনতার ছদ্মনাম ধারণ করেছে। সেকালের ব্যভিচার একালে লিভটুগেদারের নান্দনিক রূপ লাভ করেছে। সুতরাং সেকালের ন্যায় একালেও সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে গেছে। হত্যা, রাহাজানি, দেশ দখল ও রাজ্য দখলের মতো ঘটনা ঘটছে অহরহ।

এমতাবস্থায় প্রয়োজন মহানবী ﷺ-এর মতো এক বলিষ্ঠ সম্মোহনী শক্তিবিশিষ্ট নেতৃত্ব। কিন্তু নবী আগমনের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং নতুন করে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই বিশ্ববাসীর উচিত সেই নবীর রেখে যাওয়া আদর্শকে আঁকড়ে ধরা। তার অনুসৃত আদর্শই কেবল পুনরায় এনে দিতে পারে শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তি।

৩. মুসনাদ আহমাদ, হা/২৩৫৪৬, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

হক্কের মানদণ্ড

মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(পর্ব-২)

জবাব : হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-কে ষষ্ঠ ত্বাবাক্বার মানুষ হিসাবে উল্লেখ্য করেছেন। আর ষষ্ঠ ত্বাবাক্বার লোক তারাই, যাদের সাথে কোনো ছাহাবীর সাক্ষাৎ হয়নি। যেমনটি ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ্য করেছেন, السادسة طبقة عامر والخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج انتهى 'ষষ্ঠ ত্বাবাক্বা হলো ত্বাবাক্বাতু আমের অনুরূপ পঞ্চম ত্বাবাক্বাও। কিন্তু এই ত্বাবাক্বার কারো সাথে কোনো ছাহাবীর সাক্ষাৎ সাব্যস্ত হয়নি'।[১]

দেখুন! মুহাক্কিক্ব আলেমদের বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই চার জন ছাহাবীর কারো সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকতে চায়, তার জন্য উল্লেখিত প্রমাণসমূহই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি এই ধরনের দাবি করবে, তার জন্য শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন। অথচ লেখক মহোদয় ছাহাবীর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি কোনো দলীল দ্বারা প্রমাণ করতে পারেননি। অর্থাৎ কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা এই দাবিকে সাব্যস্ত করেননি। সাহল ইবনু সা'দ এবং আবূ তুফায়েল রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনা পেশ না করার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কিন্তু আনাস ও আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাতের ব্যাপারে তিনি ত্বহত্বীর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও বাস্তবতার দৃষ্টিতে লোক দেখানো মাত্র। কেননা ত্বহত্বী এবং তার মতো ব্যক্তিরা কোনো বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কোনো কথা এমন দাবির ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ নেওয়া যাবে না, যতক্ষণ না বর্ণনাকারীদের থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রমাণিত না হবে। কেননা মুক্বাল্লিদ ফক্বীহগণ নিজেদের ইমামের প্রশংসা করতে গিয়ে কত কথাই না লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, দুররে মুখতার গ্রন্থের লেখক তার গ্রন্থে ইমাম আ'যমের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রচণ্ড পর্যায়ের বাড়াবাড়ি করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম তথা ঈসা আলাইহিস সালাম ও শেষ যুগে এসে ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের উপর আমল করবেন। তিনি বলেন, حيث قال إلى أن يحكم بمذهبه عيسى عليه الصلوة والسلام 'ঈসা আলাইহিস সালাম ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের উপর রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন তথা আমল করবেন'।[২] যদিও হালাবী রাহিমাহুল্লাহ এই কথার ব্যাখ্যা দেওয়ার অপচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার এই ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লেখক তার এই ধরনের ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট। এজন্যই ত্বহত্বী হালাবীর বক্তব্য উল্লেখ করার পর প্রতি উত্তরে বলেছেন, والذي ينبغي للطائفة الحنفية لا يتكلموا بهذه الألفاظ الموهمة فإنها موجبه للتكلم فيهم بل أن بعض الحمقى يسبون الإمام وينفون الاجتهاد فالأولى تجنبه انتهى 'হানাফীদের জন্য উচিত, তারা যেন এই ধরনের বক্তব্য না দেয়, যা দ্বারা ইমামদের প্রশ্নবিদ্ধ বা হাসির পাত্র হতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে কিছু অজ্ঞ লোক ইমাম আবূ হানীফাকে গালি দেয় এবং তিনি মুজতাহিদ এই কথা অস্বীকার করেন। এই ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকা উত্তম'।

কিছু হানাফী এ কথাও বলে থাকে, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ খাযির আলাইহিস সালাম-এর শিক্ষক ছিলেন। খাযির আলাইহিস সালাম তার নিকট হতে ৩০ বছর যাবৎ শিক্ষা লাভ করেছেন। পাঁচ বছর তার জীবদ্দশায় এবং পঁচিশ বছর তার মৃত্যুর পর কবরে। ইমাম ত্বহাবী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন,

اعلم أن الله قد خص أبا حنيفة بالشريعة والكرامات ومن كراماته أن الخضر عليه السلام كان يجئ اليه كل يوم وقت الصبح ويتعلم منه أحكام الشريعة إلى خمس سنين فلما توفي أبو حنيفة ناجى الخضر ربه إلهي! إن كان لي عندك منزلة فأذن لأبي حنيفة حتى يعلمني من القبر على حسب عادته حتى أعلم شرع محمد على الكمال لتحصل لي الطريقة والحقيقة فنودي أن اذهب إلى قبره وتعلم منه ما شئت فجاء الخضر عليه السلام وتعلم منه ما شاء كذلك إلى خمس وعشرين سنة حتى أتمه الدلائل والأقاويل انتهى.

'জেনে রাখো! আল্লাহ ইমাম আবূ হানীফাকে শরীআত এবং কারামতের জন্য নির্বাচন করেছেন। তার অসংখ্য কারামতের মধ্য হতে একটি কারামত হলো— খাযির আলাইহিস সালাম পাঁচ বছর যাবৎ প্রতিদিন সকালে তাঁর নিকট আসতেন এবং তার নিকট হতে শরীআতের বিধিবিধান শিখতেন। যখন আবূ হানীফা মারা গেলেন, তখন খাযির আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আপনার নিকট যদি আমার কিঞ্চিৎ মর্যাদা থেকে থাকে, তাহলে আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-কে অনুমতি দিন- তিনি যেন পূর্বের ন্যায় কবর থেকে আমাকে শিক্ষা দেন, যাতে করে আমি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীআতের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারি। অতঃপর আওয়াজ দেওয়া হলো— তার কবরের নিকট যাও

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. তাক্বরীবুত তাহযীব, 'ভূমিকা' পৃ. ১০ ।

২. আদ-দুররুল মুখতার আলা হাশিয়াতি রাদ্দুল মুখতার, 'ভূমিকা' ১/৩৯।

www.al-itisam.com

এবং যা কিছু শিখতে চাও, তার নিকট শিখে নাও। অতঃপর খাযির আলাইহিস সালাম তার কবরের নিকট আসলেন এবং যা কিছু শেখার ইচ্ছা ছিল শিখে নিলেন। তিনি এভাবে ২৫ বছর তার নিকট সকল দলীলভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করেন'।[৩]

এর থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে ত্বহত্বীর একটি বর্ণনায় কুশায়রীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়, যেখানে খাযির আলাইহিস সালাম-কে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর মুক্বাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী) বানানো হয়েছে। এছাড়া অতি প্রশংসাকারী মুক্বাল্লিদ ব্যক্তিদের নিকট থেকে নিজ নিজ ইমামদের শানে এমন আরো অনেক বক্তব্য রয়েছে। শুধু প্রশংসাকারীদের কথা যদি অহী সমতুল্য হতো আর এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে দলীল এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার প্রয়োজন না হতো, তাহলে কুশায়রী ও খাযির আলাইহিস সালাম এবং এরূপ বানোয়াট ঘটনাগুলোকে হানাফী বিদ্বানগণ কেন প্রত্যাখ্যান করলেন? দেখুন ত্বহত্বীর বর্ণিত ঘটনাগুলোর ব্যাপারে কত বিরূপ বক্তব্য রয়েছে। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ত্বহত্বী এবং তার মতো যারা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর ব্যাপারে তাবেঈ হওয়ার দাবি করেছেন, তাদের বক্তব্য ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর তাবেঈ সাব্যস্ত করতে পারবে না যতক্ষণ কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হতে তা প্রমাণিত না হবে।ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ-এর উছূলের ভিত্তিতে যদি কেউ দাবি করে যে, এই সকল ছাহাবীর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাতের বিষয়টি যদিও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু তিনি তো সেই যুগের ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং তিনি আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা থেকে বর্ণনা করতেই পারেন এবং করেছেন, যা ইমাম ত্বহত্বীসহ অন্যরা তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং একই যুগের হওয়ার কারণে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আনাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আওফার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তাদের এই দাবির প্রতি উত্তর নিম্নরূপ :

ইমাম ত্বহত্বীসহ যারা মুত্তাছিল সনদসহ ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ আনাস এবং আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন মর্মে দাবি করেছেন, তারা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ থেকে এ কথা বর্ণনা করেননি। ইলমে হাদীছ এবং সীরাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা একান্ত জরুরী। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ 'সনদ হচ্ছে দ্বীন। কেননা দ্বীনের ক্ষেত্রে যদি সনদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকত, তাহলে সত্য-মিথ্যার বাছবিচার না করে যার যা ইচ্ছা বলত'।

(চলবে)

৩. ত্বহত্বী, 'ভূমিকা' ১/৪০।

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার ১০টি উপায়

-আতাউর রহমান*

(পর্ব-২)

(৫) তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস রাখা : সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সবকিছুর ক্ষেত্রেই মুমিন বান্দা তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর দুঃখ-হতাশা, অভাব-অনটন, বিপদ-আপদে তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস থাকলে কোনো মানুষই মানসিক চাপে ভোগে না। তাই মানসিক চাপের সময় মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে তাক্বদীরের উপর ছেড়ে দেওয়ায় রয়েছে মানসিক প্রশান্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ‘যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদই আসে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই কিতাবে (তাক্বদীরে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ’ *(আল-হাদীদ, ৫৭/২২)*। আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে, যমীনের বুকে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে তথা লওহে মাহফূযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। যমীনের বুকে সংঘটিত বিপদাপদ বলতে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলের ক্ষতি, ব্যবসায় ক্ষতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, ক্ষুধা ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। আর ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলতে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।[১] আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ‘আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো ক্ষতির স্পর্শ করান, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার কাছে সেটা পৌঁছে দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু’ *(ইউনুস, ১০/১০৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ‘আর যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে কোনো দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কোনো কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান’ *(আল-আনআম, ৬/১৭)*। উল্লেখিত আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো, প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা। সত্যিকারভাবে কোনো ব্যক্তি কারো সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আল্লাহ যদি কারো লাভ করতে চান, তবে তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে বৎস! আমি বললাম, আদেশ করুন, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর বিধিবিধানকে হেফাযত করবে, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর বিধিবিধানকে হেফাযত করো, তাহলে আল্লাহকে সাহায্যের সাথে তোমার সামনে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোনো কিছু চাইতে হলে তুমি আল্লাহর কাছেই চাও এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে তোমার কোনো উপকার করতে চাইলে যা তোমার তাক্বদীরে লেখা নেই, তারা তা কখনো করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার তাক্বদীরে লেখা নেই, তবে কখনোই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আমল করতে পার, তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধরো। কেননা তুমি যা অপছন্দ কর, তার বিপক্ষে ধৈর্যধারণ করায় অনেক কল্যাণ রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত, কষ্টের সাথে সুখ, এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত।[২]

সুধী পাঠক! অতি পরিতাপের বিষয় হলো, কুরআনের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা এই ব্যাপারে পথভ্রান্ত। আমরা সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ সবকিছুর ক্ষেত্রেই তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. কুরতুবী, ১৭/২২০।

২. আহমাদ, হা/২৮০৪, ১/৩০৭; তিরমিযী, হা/২৫১৬, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

করতে চাই না। অথচ দুঃখ-হতাশা, অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ এই সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং এটিই তাক্বদীর। আর তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস থাকলে কোনো মানুষই মানসিক চাপে থাকবে না। তাই মানসিক চাপের সময় মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে তাক্বদীরের উপর ছেড়ে দেওয়ার মাঝেই রয়েছে মানসিক প্রশান্তি।

(৬) হতাশ না হওয়া : অনেক ক্ষেত্রেই হতাশা থেকে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। তাই দুনিয়ার জীবনে, বিপদ-আপদে হতাশ না হওয়াই ঈমানদারদের কাজ। যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের বিপদাপদ আসতে পারে- এ মানসিকতা সবসময় পোষণ করতে হবে। ফলে, তা মানুষকে বিপদাপদে হতাশা থেকে রক্ষা করে মানসিক চাপমুক্ত রাখবে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসব বিপদ-আপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জানমাল ও ফল-ফলাদি ক্ষতির মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। তাদেরকে যখন বিপদ-আপদ আক্রান্ত করে তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে যাব। তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫-১৫৭)*।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে পরীক্ষার কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা এখানে বিপদাপদ আসার আগেই সকলকে সংবাদ দিয়েছেন। কারণ কোনো বিপদে পতিত হওয়ার পূর্বেই যদি সে সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা হঠাৎ করে কোনো বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশি হয়। ফলে হতাশার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবারই অনুধাবন করা উচিত যে, এই দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। এর ফলে হতাশা নামক ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। মূলত মানুষের ঈমান অনুসারেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা, বিপদাপদ, বালা-মুছীবত নবীদেরকে প্রদান করেন। তারপর যারা তাদের পরের লোক, তারপর যারা এদের পরের লোক, তারপর যারা এর পরের লোক’।[৩] অর্থাৎ প্রত্যেকের ঈমান অনুসারেই তাদের পরীক্ষা হয়ে থাকে। অন্য একটি হাদীছে রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ ‘মুমিনের উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, কীভাবে নিজেকে অপমানিত করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন কোনো বালা-মুছীবতের সম্মুখীন হয়, যা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই’।[৪]

সুতরাং যে কোনো ধরনের বিপদাপদের সম্মুখীন হলে হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর উক্ত আয়াতে ধৈর্যশীলদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ উচ্চারণ : *‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন’* পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পতিত হলে যেন এ দু‘আটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে যেমন অনেক নেকী লাভ করা যায়, ঠিক তেমনি যদি এ বাক্যের অর্থের দিকে যথার্থ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তি লাভ এবং তা থেকে উত্তরণের পথ সহজতর হয়ে যায়। দু‘আটির অর্থ হলো, ‘নিশ্চয় আমরা তো আল্লাহরই, আর আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব’। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের কোনো কষ্ট দেন তবে তাতে কোনো না কোনো মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যকে সম্মান করতে পারা একটি মহৎ কাজ। আর এটিই হচ্ছে ছবর তথা ধৈর্য।

একটি হাদীছে রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কেউ বিপদে পতিত হলে যদি এ দু‘আ পড়ে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ এবং বলে, اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا উচ্চারণ: *‘আল্লাহুম্মা আজুরনি ফি মুছীবাতি ওয়া আখলিফ লি খাইরাম মিনহা’* তাহলে তাকে উত্তম বস্তু ফিরিয়ে দিবেন’।[৫]

সুধী পাঠক! উক্ত বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এটা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, হতাশা থেকে মুক্তি পেতে হলে ধৈর্যধারণ করার বিকল্প নেই। তাই আমাদের উচিত, যে কোনো ধরনের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা।

(৭) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা : মানসিক অশান্তি থেকে রক্ষা পেতে মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের

৩. আহমাদ, ৬/৩৬৯, হাদীছ ছহীহ।
৪. তিরমিযী, হা/২২৫৪, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৪০১৬।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১৮।

বিকল্প নেই। কেননা মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন, ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ‘আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট’ *(আত-তালাক, ৬৫/৩)*। অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ‘যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করতে পার, তাহলে তোমাদের এমনভাবে রিযিক্ব দেওয়া হবে, যেভাবে পাখিকে রিযিক্ব দেওয়া হয়। পাখি সকাল বেলায় খালি পেটে (ক্ষুধার্ত অবস্থায়) বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় পেটভরে বাসায় ফিরে আসে’।[৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ‘আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহরই। আর তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সবকিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে’ *(হূদ, ১১/৬)*। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন, ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ‘বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান। আপনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক্ব দান করেন’ *(আলে ইমরান, ৩/২৬-২৭)*। অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে’।[৭]

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আমরা যদি সকল ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের বিপদাপদে হতাশা না হয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করি যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি যা চান তাই করতে পারেন, তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী, রিযিক্বদাতা, মুছীবত থেকে উদ্ধারকারী, তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছে তাকে অপমানিত করেন, এই বিশ্বাস স্থাপন করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারি, তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহ আমাদের সকল বিষয় সমাধান করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। কেননা আল্লাহর প্রতি আমরা যেরকম ধারণা পোষণ করব, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে সেরকম আচরণ করবেন, যা উপরে উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

(৮) বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা : মৃত্যুর স্মরণ মানসিক চাপকে একেবারেই মিটিয়ে দেয়। মৃত্যুর স্মরণ মানুষের দুনিয়া ও পরকালের অনেক উপকারে আসে। যারা চরম সংকটে, পেরেশানীতে ও মানসিক চাপে ভোগে, মৃত্যুর কথা স্মরণে তাদের বিষয়গুলো সহজ হয়ে যাবে এবং এগুলো দূর হয়ে যাবে। আর যারা অতি সুখে, আরামে আছে মৃত্যুর কথা স্মরণে তাদের কাছে আরাম, সুখ সবকিছুকে তিক্ত করে তুলবে, দুনিয়ার সুখকে নগণ্য করে তুলবে।

আর পরকালের উপকারের দুটি বড় দিক রয়েছে। তা হলো, প্রথমত, মৃত্যুর কথা স্মরণে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয়ত, বান্দা যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তখন সে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে তৎপর হবে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে নছীহত করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, اسْتَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ، فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ اللهُ، وَلَا ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ ‘তোমরা স্বাদ কর্তনকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো সংকটে বা কষ্টের সময় তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সংকট বা কষ্ট সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তা কোনো সুখের সময় স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির নিকট সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে’।[৮]

উপরে উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আমরা যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, পেরেশানীতে ও মানসিক চাপে থাকি, তখন আমরা যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, তাহলে আমাদের এ বিষয়গুলো দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(চলবে)

৬. তিরমিযী, হা/২৩৪৪, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৪১৬৪।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৫।
৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/২৯৯৩; হাসান ছহীহ।

www.al-itisam.com

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী
*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(পর্ব-২)

৮ম দলীল : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ 'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীনের সকল অধিবাসী, এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়া এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমণ্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও উত্তম দু'আ করে থাকে'।[১]

৯ম দলীল : আবুদ-দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের অধিবাসী আলেমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছরা পর্যন্ত'।[২]

মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান পৌঁছা প্রসঙ্গে :

কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত যে, মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান পৌঁছে। নিম্নে দলীলসমূহ পেশ করা হলো :

প্রথমত, কুরআনুল কারীম থেকে দলীল:

১ম দলীল : আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ '(এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা অগ্রবর্তীদের পরে (ইসলামের ছায়াতলে) এসেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আর আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করো, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বড়ই করুণাময়, অতিদয়ালু' *(আল-হাশর, ৫৯/১০)*।

২য় দলীল : আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ 'কাজেই জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ভুলত্রুটির জন্য আর মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য, আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/১৯)*।

৩য় দলীল : নূহ আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ পূর্বক আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ 'হে আমার রব! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে যারা আমার গৃহে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে; আর যালেমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না' *(আন-নূহ, ৭১/২৮)*।

৪র্থ দলীল : ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ পূর্বক আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল করো। হে আমাদের প্রতিপালক! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিয়ো' *(ইবরাহীম, ১৪/৪০-৪১)*।

দ্বিতীয়ত, হাদীছ থেকে দলীল :

১ম দলীল : আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ 'ছিয়ামের ক্বাযা

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. তিরমিযী, 'ইলম' অধ্যায়, 'জ্ঞানের মর্যাদা ইবাদতের চেয়েও বেশি' অনুচ্ছেদ, ৫/৫০, হা/২৬৮৫, আলবানী রহিমাহুল্লাহ ছহীহ সুনানে তিরমিযী (২/৩৪৩)-তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন; মিশকাত, ১/৭৪, হা/২১৩ ।

২. ইবনু মাজাহ, 'মুকাদ্দামা' 'মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদাতার ছওয়াব' অনুচ্ছেদ, হা/২৩৯, আলবানী রহিমাহুল্লাহ ছহীহ সুনানে ইবনু মাজাহ (১/৯৭)-তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

www.al-itisam.com

যিম্মায় রেখে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে ছিয়াম আদায় করবে’।[৩]

২য় দলীল : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنَّ الله تبارك وتعالى أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عز وجل فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ قرابة لها إما أُخْتُهَا أَوْ ابْنَتُهَا إِلَى النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال أَرَأَيْتِكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى عَنْ أُمِّكِ ‘এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করল, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে এক মাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে সমুদ্রে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেল। তার নিকটাত্মীয় (তার বোন অথবা মেয়ে) নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এসে তার ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, মনে করো, তার যদি কোনো ঋণ বাকী থাকত তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধযোগ্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সুতরাং তুমি তোমার মাতার পক্ষ থেকে ছিয়াম ক্বাযা করে দাও’।[৪]

৩য় দলীল : ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضى الله عنه اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا ‘সা‘দ ইবনু উবাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মানত ছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা পূর্ণ করো’।[৫]

৪র্থ দলীল : সা‘দ ইবনু আত্বওয়াল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً قَالَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ قَالَ: فَقَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ وفي رواية صادقة ‘তার ভাই মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনশ দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। তিনি বলেন, আমি সেগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে ইচ্ছা করলাম। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমার ভাই ঋণের কারণে আটকে রয়েছে (চলে যাও)। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সা‘দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) চলে গিয়ে তার পক্ষ থেকে তা (ঋণ) পরিশোধ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পক্ষ থেকে সব (ঋণ) পরিশোধ করেছি, কিন্তু এক মহিলার দাবিকৃত দু’টি দীনার বাকী রয়েছে। কিন্তু তার নিকট কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বলেন, তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ সে ন্যায়পন্থী। অন্য বর্ণনা রয়েছে, সে সত্যবাদিনী’।[৬]

---

৩. ছহীহ বুখারী, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ছিয়ামের ক্বাযা রেখে যিনি মারা যান’ অনুচ্ছেদ, হা/১৯৫২; ছহীহ মুসলিম, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ‘মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করার বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ, হা/১১৪৭; আবূ দাঊদ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, কোনো ব্যক্তি ক্বাযা ছিয়াম রেখে মারা গেলে’ অনুচ্ছেদ, হা/২৪০০; অনুরূপ বায়হাক্বী, ৬/২৭৯; ত্বহাবী, ‘মুশকিলুল আছার’, ৩/১৪০, ১৪১; মুসনাদে আহমাদ, ৬/৬৯।

৪. আবূ দাঊদ, ‘শপথ ও মানত’ অধ্যায়, ‘মৃতের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৩৩০৮; নাসাঈ, ‘মানত’ অধ্যায়, ‘মানত করে যে ব্যক্তি মারা গেল’ অনুচ্ছেদ, হা/৩৮৫০; ত্বহাবী, ৩/১৪০; বায়হাক্বী, ৪/২৫৫, ২৫৬, ১০/৮৫; ত্বায়ালিসী, হা/২৬৩০; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৬১, ১৯৭০, ৩১৩৭, ৩২২৪, ৩৪২০, এ বর্ণনা পরস্পরটি ইমাম আহমাদের হাদীছের দ্বিতীয় অংশে বৃদ্ধির সাথে রয়েছে। দু’শায়খ (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম)-এর শর্তানুপাতে হাদীছের সনদ ছহীহ। আর প্রথম অতিরিক্ত অংশটুকু ইমাম আবূ দাঊদ ও বায়হাক্বীর ছিল। ইমাম বুখারী হাদীছটি ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ছিয়ামের ক্বাযা রেখে যিনি মারা যান’ অনুচ্ছেদ, হা/১৯৫৩-এ বর্ণনা করেছেন; ইমাম মুসলিম হাদীছটি ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ‘মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করার বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ, হা/১১৪৭; তিরমিযী, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ‘মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম আদায় করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৭১৬; ইবনু মাজাহ, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ‘যে ব্যক্তি মানতের ছিয়াম যিম্মায় রেখে মারা গেল’ অনুচ্ছেদ, হা/১৭৫৮, ১৭৫৯, অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের নিকট এ হাদীছে দ্বিতীয় অতিরিক্ত অংশটুকু রয়েছে। আর ইমাম মুসলিমের নিকটে শেষ অংশটুকু রয়েছে।

৫. ছহীহ বুখারী, ‘অছিয়ত’ অধ্যায়, ‘আকস্মাৎ কেউ মারা গেলে তার জন্য দান-খয়রাত আর মৃতের পক্ষ থেকে তার মানত আদায় করা’ অনুচ্ছেদ, হা/২৭৬১ (৬৬৯৮, ৬৯৫৯); ছহীহ মুসলিম, ‘মানত পূর্ণ করার নির্দেশ’ অনুচ্ছেদ, হা/১৬৩৮; আবূ দাঊদ, ‘শপথ ও মানত’ অধ্যায়, ‘মৃত্যের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করা’ অনুচ্ছেদ, হা/৩৩০৭; তিরমিযী, ‘মানত’ অধ্যায়, ‘মৃত্যের পক্ষ থেকে মানত পূর্ণ করা’ অনুচ্ছেদ, হা/১৫৪৬; নাসাঈ, ‘মানত ও শপথ’ অধ্যায়, ‘যে ব্যক্তি মানত আদায় না করে মারা যায়’ অনুচ্ছেদ, হা/৩৮৪৮; ইবনু মাজাহ, ‘কাফফারাসমূহ’ অধ্যায়, ‘যে ব্যক্তি মানত আদায় না করে মারা যায়’ অনুচ্ছেদ, হা/২১৩২; বায়হাক্বী, (৪/২৫৬, ৬/২৭৮, ১০/৮৫)-তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন; ত্বায়ালিসী, হা/২৭১৭; আহমাদ, হা/১৮৯৩, ৩০৪৯, ৬/৪৭।

৬. ইবনু মাজাহ, ‘বিচার ও বিধান’ অধ্যায়, ‘মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা’ অনুচ্ছেদ, হা/২৪৩৩; মুসনাদে আহমাদ, ৪/১৩৬, ৫/৭; বায়হাক্বী ১০/১৪২, হাদীছটির দু’টি সনদের প্রথমটি ছহীহ, আর দ্বিতীয়টি হলো ইবনু মাজাহর সনদের ন্যায়। বুছায়রী এ সনদটিকে ‘আল-জাওয়াইদ’ গ্রন্থে ছহীহ বলেছেন। হাদীছের বর্ণনা ও দ্বিতীয় রেওয়াতটি হলো ইমাম বায়হাক্বীর। এ বর্ণনাটি এবং ইমাম আহমাদের অতিরিক্ত বর্ণনাগুলো একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়।

৫ম দলীল : সামুরা ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أن النبي ﷺ صلى على جنازة و في رواية صلَّى الصبح فلما انصرف قال أههنا من آل فلان أحد فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا فقال ذاك مرارا ثلاثاً لا يجيبه أحدٌ فقال رجل هوذا قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي ﷺ مامنعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني أما أني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحدٌ يطلبه بشيء ‘নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানাযার ছালাত আদায় করলেন (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ফজরের ছালাত আদায় করলেন)। অতঃপর ছালাত শেষে বললেন, এখানে অমুক গোত্রের কেউ আছে কি? তখন গোত্রের লোকেরা নিশ্চুপ রইল (সাধারণত যখন তিনি তাদের নিয়ে কোনো কিছু শুরু করতেন, তখন তারা সবাই চুপ থাকতেন)। তিনি বার বার বললেন, এখানে অমুক গোত্রের কেউ আছে কি? (তিনি তিন বার বললেন, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না)। (তখনই এক ব্যক্তি বলে বসল যে, তিনিই অমুক গোত্রের)। বর্ণনাকারী বলেন, তখনই মানুষের পিছন থেকে লুঙ্গি ঝুলানো অবস্থায় এক ব্যক্তি দাঁড়াল। (তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, প্রথম দু'ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কীসে বাধা দিয়েছে?) আমি ভালোর জন্যই বিশেষভাবে তোমার নাম উল্লেখ করেছি। তোমাদের মাঝে অমুক ব্যক্তি ঋণের কারণে জান্নাত যেতে পারছে না। যদি তোমরা চাও, তাহলে তোমরা তার ঋণ পরিশোধ করতে পার। আর যদি চাও, তাহলে তোমরা তাকে আল্লাহর আযাবে সোপর্দ করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার পরিবারকে এবং যারা তার বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিল তাদেরকে দেখলাম; তারা প্রয়াস চালিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করে দিল। শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু দাবি করার কেউ বাকী রইল না'।[৭+৮]

৬ষ্ঠ দলীল : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেলে আমরা তাকে গোসল করালাম, কাফন পরালাম এবং মমি করে জানাযা রাখার স্থানে মাক্বামে জিবরীল-এর কাছে রাখলাম। জানাযার ছালাতের জন্য রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমরা বললাম। তিনি আমাদের সাথে হেঁটে হেঁটে এসে বললেন, তোমাদের সাথীর উপর সম্ভবত ঋণ রয়েছে। তারা বলল, হ্যাঁ, দু'দীনার ঋণ রয়েছে। অতঃপর তিনি পিছনে হেঁটে বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার ছালাত পড়ো। তখন আমাদের মাঝে আবু ক্বাতাদা নামক এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দু'দীনার প্রশিোধ করার দায়িত্ব আমার। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুরু করলেন, দু'দীনার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব তোমার, আর মৃত ব্যক্তি দু'দীনার ঋণ থেকে মুক্ত? সে বলল, হ্যাঁ, তাই। তারপর তিনি জানাযার ছালাত পড়লেন। আবূ ক্বাতাদার সাথে যখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ হতো, তখন তিনি বলতেন, (অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, দুপুরে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, দু'দীনার কি হয়েছে? [পরিশোধ করেছ?] উত্তরে সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সে তো গতকাল মারা গেল, এখনো পরিশোধ করা হয়নি)। অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে, দুপুরে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, দু'দীনার কি হয়েছে? উত্তরে সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তা পরিশোধ করে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, এখন সে শান্তি পেল'।[৯+১০]

(চলবে)

---

৭. আবূ দাঊদ, 'ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়, 'ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধে কড়াকড়ি করা' অনুচ্ছেদ, হা/৩৩৪১; নাসাঈ, 'ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়, 'ঋণ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী' অনুচ্ছেদ, হা/৪৬৮৯; হাকেম, ২/২৫, ২৬; বায়হাক্বী ৬/৪, ৬৭; ত্বায়ালিসী, স্বীয় মুসনাদ, হা/৮৯১, ৮৯২; অনুরূপ আহমাদ, ৫/১১, ১৩, ২০; আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'তাদের কতিপয় (রাবী) বর্ণনাকারী 'শা'বী হতে, শা'বী সামূরা হতে বর্ণনা করেছেন। আবার তাদের কতিপয় (রাবী) বর্ণনাকারী শা'বী এবং সামূরা এর মাঝে সামআন ইবনু মাশনাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। হাদীছটি প্রথম দিক থেকে দু'শায়খ (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম)-এর শর্তানুসারে সনদ ছহীহ; যেমনটি হাকেম বলেছেন আর ইমাম যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর দ্বিতীয় দিক থেকে শুধু ছহীহ। অন্য বর্ণনাটি দু'মুসনাদ গ্রন্থে রয়েছে। প্রথম বৃদ্ধি, দ্বিতীয় বৃদ্ধি হলো হাকেমের অনুরূপভাবে তৃতীয় ও পঞ্চম বৃদ্ধি অংশটুকুও হলো তার। বায়হাক্বীর দ্বিতীয় বৃদ্ধি, ইমাম আহমাদের হলো তৃতীয় এবং চতুর্থ বৃদ্ধি, ত্বায়ালিসীর হলো পঞ্চম বৃদ্ধি, আহমাদ ও আবূ দাউদের হলো ষষ্ঠ বৃদ্ধি অংশটুকু।

৮. আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছটির শাহেদ হাদীছ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)-এর বর্ণিত হাদীছ; ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর, (১৫৬/২), সনদ যঈফ।

৯. হাকেম, ২/৫৮; বায়হাক্বী, ৬/৭৪, ৭৫, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; ত্বায়ালিসী, হা/১৬৭৩; মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৩০, আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সনদ হাসান, যেমনটি হায়ছামী (৩/৩৯) বলেছেন। হাকেম বর্ণনা করার পর বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ আর যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছে। অতিরিক্ত অংশগুলোসহ অন্য বর্ণনাটি হাকেম ব্যতীত তাদের সকলের নিকট রয়েছে। তবে, দ্বিতীয় অতিরিক্ত অংশটি শুধু ত্বায়ালিসীর একক।

১০. অর্থাৎ, তার ঋণ পরিশোধের পরে তার থেকে শাস্তি দূর হওয়ার কারণে।

রজব মাসের বিশেষ ছালাত চূড়ান্ত বিদআত

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

রজব মাসের অন্যতম বিদআত ছালাতুর রাগায়েব। এ ছালাত পড়া হয় রজব মাসের প্রথম শুক্রবার মাগরিব ও এশার মাঝে। আর তার আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিনে ছিয়াম রাখা হয়। এ ছালাতের ভিত্তি একটি বানোয়াট হাদীছ। সেই হাদীছে তার ফযীলত ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

ছালাতুর রাগায়েব আদায়ের বানোয়াট পদ্ধতি :

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘রজব হলো মহান আল্লাহর মাস, আর শা‘বান আমার মাস এবং রামাযান আমার উম্মতের মাস। কোনো ব্যক্তি যদি রজবের প্রথম বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখে এবং শুক্রবার মাগরিব ও এশার মাঝে ১২ রাকআত ছালাত আদায় করবে, প্রতি রাকআতে সূরা ‘আল-ফাতেহা’ এক বার, সূরা ‘আল-ক্বদর’ তিন বার, ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ ১২ বার পড়বে— এভাবে প্রতি দু’রাকআত পর সালাম ফিরাবে, তারপর আমার ওপর ৭০ বার এ দরূদ পড়বে- *‘আল্লাহুম্মা ছল্লী আলা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি ওয়া আ‘লা আলিহ’;* অতঃপর একটা সিজদা দিবে— তাতে ৭০ বার পাঠ করবে, *‘সুব্বূহুন কুদ্দূসুন, রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ’,* তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বলবে, *‘রব্বিগফিরলি ওয়ারহাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা‘লাম, ইন্নাকা আনতাল আযীযুল আযীম’* ৭০ বার, অতঃপর ২য় সিজদা দিবে এবং প্রথম সিজদায় যা যা পড়েছে সেগুলো পড়বে, অতঃপর আল্লাহ তাআলার নিকট তার প্রয়োজন তুলে ধরে দু‘আ করলে আল্লাহ তাআলা তা পূরণ করবেন’।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো বান্দা অথবা বান্দী যদি এই ছালাত আদায় করে, তবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনা এবং বৃক্ষরাজির পাতা সমপরিমাণ হয় এবং তার পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে ৭০ জনের জন্য তার শাফাআত কবুল করা হবে। আর কবরের প্রথম রজনিতে এই ছালাতের ছওয়াব তার সামনে এসে হাযির হবে উজ্জ্বল চেহারা আর মিষ্টভাষী হয়ে— আর বলবে, হে আমার বন্ধু! আমি তোমার সেই ছালাতের ছওয়াব, যা তুমি অমুক মাসের অমুক রাতে পড়েছিলে। আজ রাতে তোমার নিকট এসেছি, যেন তোমার প্রয়োজন পূরণ করি, তোমার নিঃসঙ্গতা ও ভয়ভীতি দূর করি। যে দিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, সে দিন কিয়ামতের মাঠে তোমার মাথার উপর ছায়া দিব। সুসংবাদ নাও, তোমার প্রভু থেকে কখনোই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না’।

উক্ত হাদীছটি ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাবে উল্লেখ করার পর বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর মিথ্যারোপ ছাড়া কিছু নয়। এ হাদীছটির রচনাকারী হিসেবে যে ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়, সে হলো ইবনু জুহাইম। মুহাদ্দিছগণ এ মিথ্যারোপকে তার দিকেই সম্বোধন করেছেন।[১] তিনি বলেন, ‘আমাদের শায়খ আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীছটির সনদের বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত। এদের পরিচয় জানার জন্য ইলমুর রিজালের কিতাবাদী তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও তাদের সম্পর্কে তথ্য পাইনি’। ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীছটি বানোয়াট এবং এর বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত। আর এটাই ছালাতুর রাগায়েব নামে পরিচিত। হাফেযুল হাদীছগণ একমত যে, এটি জাল হাদীছ।[২]

ফিরোযাবাদী আল-মুখতাছার কিতাবে বলেন, সর্বসম্মতিক্রমে এটি জাল। অনুরূপ কথা বলেন, ইমাম মাক্বদেসী। এ হাদীছটি রাযীন ইবনু মুআবিয়া আল-আব্দারীর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কথা হলো, তিনি তার কিতাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক বানোয়াট ও অদ্ভুত কথাবার্তা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোথা থেকে এসব বর্ণনা করেছেন, তা জানা যায় না। এটা মুসলিমদের প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা।[৩]

ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীছটির মাধ্যমে বাড়াবাড়ি রকমের বিদআত চালু করা হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তি এ ছালাত পড়তে চায়, তাকে দিনে ছিয়াম রাখতে হবে। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম থাকলেও হয়ত সে ছিয়াম রাখল। কিন্তু

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূআত, ২/১২৪-১২৬।
২. ইমাম শাওকানী, ফাওয়ায়িদুল মাজমূআত, পৃ. ৪৭-৪৮।
৩. আবূ শামাহ, আল-বায়িস, পৃ. ৪০।

ইফতার করার সময় ভালো করে খাওয়াদাওয়া সম্ভব হলো না। তারপরও মাগরিবের ছালাত আদায় করার পর লম্বা তাসবীহ আর দীর্ঘ সিজদা দিয়ে এই ছালাত পড়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে সেই ব্যক্তির কষ্ট চরম পর্যায়ে পৌঁছবে। রামাযান মাস আর রামাযানের তারাবীর ছালাতের ব্যাপারে আমার মনে কষ্ট লাগছে! কীভাবে তথাকথিত এই ছালাতকে রামাযান ও তারাবীর সাথে টক্কর লাগানো হয়েছে! সাধারণ লোকজনের নিকট তো এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের জামাআতে শরীক হতো না সেও এই ছালাতে হাযির হবে।[৪]

ছালাতুর রাগায়েবের উৎপত্তি?

এই ছালাত প্রথম চালু হয় বায়তুল মাক্বদেসে। সেটা ছিল ৪৮০ হিজরীর পরে। এর আগে কখনো কেউ এ ছালাত আদায় হয়নি।

গাযালী আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর নামে বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীছটি উল্লেখ করার পর এটির নাম দেন রজবের ছালাত। আর বলেন, এটা পড়া মুস্তাহাব! আরও বলেন, এটি ঐ সকল নিয়মিত ছালাতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো প্রতি বছর এক বার করে আসে। যেমন— শা'বানের শবেবরাতের ছালাত, রজবের ছালাত ইত্যাদি। এর মর্যাদা যদিও তারাবীহ এবং ঈদের ছালাতের পর্যায়ের নয়, তথাপি যেহেতু একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আর বায়তুল মাক্বদেসের লোকজনও সর্বসম্মতভাবে নিয়মিত আদায় করে আসছে, এমনকি তারা কাউকে এই ছালাত ছাড়ার অনুমতি দেয় না, তাই এটার উল্লেখ করা ভালো মনে করলাম![৫]

অথচ মোটেও কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা তার কোনো ছাহাবী কখনো তা পড়েছেন বা পড়তে বলেছেন অথবা কোনো সালাফে ছালেহীন থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।[৬]

ছালাতুর রাগায়েবের ব্যাপারে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ছালাতুর রাগায়েবের কোনো ভিত্তি নেই, বরং এটি বিদআত। সুতরাং একাকী কিংবা জামাআতের সাথে পড়াকে মুস্তাহাব বলা যাবে না। বরং ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষভাবে শুধু জুমআর রাতে নফল ছালাত পড়তে আর দিনের বেলা ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। ছালাতুর রাগায়েবের ব্যাপারে যে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়, তা আলেমগণের সর্বসম্মত মতানুসারে বানোয়াট। কোনো সালাফে ছালেহীন অথবা ইমাম আদৌ এটি উল্লেখ করেননি।[৭] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অনুরূপভাবে রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে ছালাতুর রাগায়েব পড়ার ব্যাপারে হাদীছগুলো বানোয়াট ও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর মিথ্যারোপ।[৮]

আল্লামা ত্বাহের পাটনী হানাফী (রহিমাহুল্লাহ) দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন, ছালাতুর রাগায়েব ও ছিয়াম পালন সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোই মাওযূ'। এ ব্যাপারে সমস্ত মুহাদ্দিছ একমত পোষণ করেছেন।

মি'রাজের রাতে নফল ছালাত :

অনেক মুসলিম ভাই ও বোন মি'রাজ উপলক্ষ্যে কেউ ১২ রাকআত, কেউ ২০ রাকআত ছালাত আদায় করে থাকেন। ইসলামী শরীআতে মি'রাজের ছালাত বলে কিছু নেই। নফল ছালাত পড়া ছওয়াবের কাজ কিন্তু মি'রাজ উপলক্ষ্যে নফল ছালাত আদায় করার কোনো ভিত্তি ও প্রমাণ ইসলামে নেই। কাজেই মি'রাজের নামে নফল ছালাত আদায় করা এবং এর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা মানে ইসলামী শরীআতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করা। আর এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে আমাদের ধর্মে এমন কিছু সংযুক্ত বা উদ্ভাবন করবে, যা তার (শরীআতের) অংশ নয়— তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[৯]

মি'রাজ উপলক্ষ্যে রজব মাসের ফযীলত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীছ শোনা যায়। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনিতে মাগরিবের ছালাতের পর ২০ রাকআত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাছ পড়বে ...'। অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মাওযূ' বা জাল।[১০]

৪. কিতাবুল মাওযূআত, ২/১২৫-১২৬।
৫. এহইয়া উলূমুদ্দীন, ১/২০২-২০৩।
৬. ইমাম ত্বরতুশী, আল-হাওয়াদীছ ওয়াল বিদা, পৃ. ১২২।
৭. মাজমূ' ফাতাওয়া, ২৩/১৩২।
৮. আল-মানারুল মুনীফ, পৃ. ৯০।
৯. ছহীহ বুখারী, ১/৩৭১।
১০. কিতাবুল মাওযূআত, ২/১২৩।

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রজবের রজনিতে ১৪ রাকআত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা এক বার, ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ বিশ বার, ‘কুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব’ তিন বার ও ‘কুল আঊযু বিরব্বিন নাস’ তিন বার পড়বে। অতঃপর ছালাত হতে ফারেগ হয়ে দশ বার দরূদ পড়বে... ’ ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মাওযূ।[১১]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রজবের দিবসে ছিয়াম পালন করবে এবং চার রাকআত ছালাত আদায় করবে, যার প্রথম রাকআতে ১০০ বার ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়বে...’ ইত্যাদি ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীছটি মাওযূ। এর সনদে উছমান নামক রাবী মুহাদ্দিছগণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত।[১২]

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ২৭ রজব (অর্থাৎ মি‘রাজের রাত্রিতে) ইবাদত করবে, তার আমলনামায় ১০০ বছরের ইবাদতের ছওয়াব লেখা হবে’। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের ছালাতের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এটি প্রমাণযোগ্য নয়।[১৩]

একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন হাদীছের দৃষ্টান্ত, اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘ছালাত হলো মুমিনদের মি‘রাজ’।[১৪]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লা-হ) ‘তাবয়ীনুল আজাব বিমা ওয়ারাদা ফী ফাযলে রজাব’ গ্রন্থে বলেন, রজব মাসের ফযীলত, রজবের ছিয়াম, রজবের ছিয়ামের নির্দিষ্ট কোনো কিছু এবং উক্ত মাসে নির্দিষ্ট কোনো রাতে ক্বিয়াম করা সম্পর্কে এমন কোনো ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি, যা দলীলের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে।[১৫] শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রজনির ছালাতের ব্যাপারে এবং এ জাতীয় অন্য ছালাতের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এটি শরীআতসম্মত নয়।[১৬]

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শুকায়রী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, অতঃপর জেনে রাখুন যে, রজবের প্রথমে অথবা মধ্যে অথবা শেষে ছালাত আদায় সম্পর্কিত প্রত্যেকটি হাদীছই অগ্রহণযোগ্য। এগুলোর উপর আমল করা যাবে না এবং সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করাও যাবে না।[১৭] আল্লামা ইবনু রজব, ইবনু হাজার আসক্বালানী, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিছ (রাহিমাহুমুল্লা-হ) এক বাক্যে বলেছেন, রজব মাসে বিশেষ কোনো ছালাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ ছালাত আদায় করলে বিশেষ ছওয়াব পাওয়া যাবে, এ মর্মে একটি হাদীছও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়, সবই বাতিল। কেননা এসবই বানোয়াট।[১৮]

১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত
১৩. গোলাম রহমান, মাহে মি‘রাজ, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর-১৯৯৮, পৃ. ২২।
১৪. মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফযীলত, পৃ. ১২৩।
১৫. মুহাম্মাদ আবুস সালাম খিযুর আশ-শুকায়রী, আস-সুনান ওয়াল মুবতাদআত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, প্রথম প্রকাশ ১৪১৫ হিজরি/১৯৯৪ ইং), পৃ. ১৩০।
১৬. আস-সুনান ওয়াল মুবতাদআত, পৃ. ১৩২।
১৭. আস-সুনান ওয়াল মুবতাদআত, পৃ. ১৩০।
১৮. আল-মাসনূ, পৃ. ২০৮৩০।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা করো। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল’

(ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১; মিশকাত, হা/১৯৮)।

www.al-itisam.com

কিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য নিরাপদ আর কাফের-মুনাফেক্বদের জন্য আতঙ্ক

*[১৩ জুমাদাল উলা, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর, ২০২১। মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ছালেহ আল-বুদাইর** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর সম্মানিত গবেষণা সহকারী **মো. তরিকুল ইসলাম**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে এমন এক দিনে একত্রিত করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। যিনি বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিছুই জানেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। এই সাক্ষ্য কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষাকারী। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, যার সুন্নাতের যে ব্যক্তি অনুসরণ করবে, সে এমন কিছুকে আঁকড়ে ধরবে যেটা তার জন্য যথেষ্ট। ছালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর, যে ছালাত সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দেয় এবং সকল পাপ মোচন করে দেয়।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আপনারা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করুন। কেননা মুত্তাক্বীগণই হলো সৌভাগ্যবান। আপনারা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করুন আর জেনে রাখুন যে, আপনাদের সকলকে তাঁর কাছেই একত্রিত করা হবে। হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় দুনিয়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। আজকের দিন দ্রুত চলে যাচ্ছে আর আগামী দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে। অচিরেই মানুষজন কষ্ট ও অস্থায়ী জগৎ থেকে প্রতিদান ও স্থায়ী জগতের দিকে স্থানান্তরিত হবে। তাই আপনারা ভালো আমল নিয়ে সেই জগতে স্থানান্তরিত হোন। পুনরায় জীবিত হওয়ার এবং হিসাবের দিনকে স্মরণ করুন। স্মরণ করুন কিয়ামতের ভয়াবহতা, সেই কঠিন মুহূর্তকে। দুনিয়া যেন আপনাদেরকে সেই প্রতিশ্রুত দিনকে ভুলিয়ে না রাখে। কিয়ামতের ভূমিকম্পনের কথা স্মরণ করুন। যেদিন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। আর তা ফেটে বিদীর্ণ হবে এবং অস্থির হয়ে পড়বে। মানুষ নত হয়ে পড়বে। সেদিন স্তন্যদানকারিণী মা তার সন্তানের কথা ভুলে যাবে, গর্ভবতীর গর্ভ খসে পড়বে। মানুষ দিশেহারা ও ভীত হয়ে পিছন দিকে পলায়ন করবে। সেদিন আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো রক্ষাকারী থাকবে না। স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া শেষ হওয়ার অনুমতি দিবেন এবং শিঙাওয়ালাকে তার শিঙায় ফুঁক দিতে আদেশ দিবেন, যেই শিঙার ফলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে মারা যাবে, তখন তিনি ভয়ানক শিঙায় ফুঁক দিবেন। এর ভয়াবহতায় অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং ভয়ে প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে যাবে। যখন মানুষজন তাদের হাটে-বাজারে থেকে তাদের অভ্যাস অনুযায়ী তারা একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে, ঠিক এমন সময় শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে তারা কোনো অছিয়তও করতে পারবে না এবং তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরেও যেতে পারবে না। বরং এই প্রচণ্ড শব্দে তারা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে মারা যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন, তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে' *(আয-যুমার, ৩৯/৬৮)*। নবী ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামত সংঘটিত হবে (এ অবস্থায়) যে, দু'ব্যক্তি (বেচাকেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমনকি তা ভাঁজ করারও সময় পাবে না। আর কিয়ামত (এমন অবস্থায়) অবশ্যই সংঘটিত হবে যে, কোনো ব্যক্তি তার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে রওয়ানা হবে কিন্তু তা পান করার সুযোগ পাবে না। কিয়ামত (এমন অবস্থায়) সংঘটিত হবে যে, কোনো ব্যক্তি (তার পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরি করবে কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সময়ও পাবে না। কিয়ামত (এমন অবস্থায়) ক্বায়েম হবে যে, কোনো ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত খাবার উঠাবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার সময় পাবে না'।[১]

মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের একটি হাড় ছাড়া মানুষের সকল কিছুই পচে যাবে। এই একটি হাড় থেকেই তাকে আবার পুনরায় গঠন করা হবে। সেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে,

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০৬।

তারকাগুলো ঝরে পড়বে, সেগুলোর আলো হারিয়ে যাবে, সূর্যকে গুটিয়ে নিয়ে আলোহীন করা হবে, পাহাড়গুলোকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে, সেগুলোর উঁচুনিচু সব সমান হয়ে যাবে, সাগরগুলোকে প্রবল বেগে প্রবাহিত করা হবে, সেগুলোর পানি হারিয়ে যাবে এবং সেখানে আগুন জ্বলে উঠবে। সেদিন আসমানসমূহ আল্লাহ তাআলা ভাঁজ করে তার ডান হাতে নিবেন। তারপর তিনি বলবেন, আমিই মালিক, দুনিয়ার প্রতাপশালী ও অহংকারীরা আজ কোথায়? তারপর তিনি যমীনকে তার বাম হাতে ভাঁজ করে ধরবেন। তারপর বলবেন, আমিই মালিক, দুনিয়ার প্রতাপশালী ও অহংকারীরা আজ কোথায়? সেদিন চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক আল্লাহ তাআলাই একমাত্র অবশিষ্ট থাকবেন, যিনি প্রথমে ছিলেন, তিনিই সকলের শেষেও থাকবেন। তখন তিনি বলবেন, আজকে রাজত্ব কার? তারপর তিনি নিজেই উত্তর দিয়ে বললেন, এক ও প্রতাপশালী আল্লাহর *(গাফের, ৪০/১৬)*। দুই শিঙার মাঝের ব্যবধান আল্লাহ যতদিন চাইবেন, ততদিন হবে। যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় শেষ হবে, তখন আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তাতেই কবরে সকল সৃষ্টির দেহ গজিয়ে উঠবে, যেমনভাবে পানির ফলে মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়। যখন দেহের গঠন পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ তাআলা শিঙাওয়ালাকে দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁক দেওয়ার আদেশ দিবেন, যাতে সকলেই তাদের কবর থেকে বের হয়। মৃতরা জীর্ণ হাড় থাকার পরে তারা আবার জীবিত হয়ে দাঁড়াবে। কিয়ামতের ভীষণ ভয়াবহতা দেখে মানুষজন সেদিন বলবে, পালাব কোথায়?

সেদিন প্রথম যিনি কবর **ফেটে** বের হবেন, তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ। হাশরের জন্য মানুষ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিবে। সেদিন এই আসমান ও যমীন বদলে দিয়ে আরেক আসমান ও যমীন হবে। আল্লাহ তাআলা পূর্বের ও পরের সকল আদম সন্তানকে সেদিন কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করবেন। সেদিন কেউ বাদ পড়বে না। আল্লাহ বলেন, ‘সেটি এমন এক দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে; আর সেটি এমন এক দিন, যেদিন সবাইকে উপস্থিত করা হবে’ *(হূদ, ১১/১০৩)*। মানুষজন তাদের কবর থেকে বের হবে খালি পায়ে, নগ্ন দেহে এবং খাতনাবিহীন অবস্থায়। ‘সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে’ *(আবাসা, ৮০/৩৭)*।

সেদিন নবী, ছিদ্দীক্ব ও সৎকর্মশীলগণের কাপড় পরিধান করানো হবে। কিয়ামতের দিন প্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। সৎ-অসৎ সকলেই সেদিন হাযির হবে এবং সকল ফেরেশতাগণ হাযির হবেন। এমনকি মানুষ, জিন, পাখি, বন্যপশু সবকিছুকেই একত্রিত করা হবে। কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে যুবক বৃদ্ধে পরিণত হবে। সেদিন হলো হিসাব ও প্রতিদানের দিন। সেদিন সূর্য এক মাইল অথবা দুই মাইল নিকটে চলে আসবে। মানুষজন তাদের আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবতে থাকবে। কারো ঘাম হবে তার **টাখনু** পর্যন্ত, কারো হবে হাঁটু পর্যন্ত, কারো হবে কোমর পর্যন্ত আবার কেউ সেই ঘামের মধ্যে ডুবতে থাকবে। সেদিন কয়েক প্রকার মানুষ রহমানের আরশের ছায়ার নিচে থাকবে। তারা প্রচণ্ড গরম ও সূর্যের তাপ থেকে নিরাপদে থাকবে। তারা হলেন— ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক, যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, ৪. সে দু’ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে ভালোবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য, ৫. সে ব্যক্তি, যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’, ৬. সে ব্যক্তি, যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে, ফলে তার দু’চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।[২]

সেদিন ভীষণ গরম হবে। ফলে পিপাসা ও মহাসংকট দেখা দিবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ﷺ-এর জন্য একটি হাওয দিবেন। নবী ﷺ বলেছেন, ‘আমার ‘হাওয’-এর ব্যবধান এক মাসের রাস্তা, তার সকল কোণ এক সমান, তার পানি রূপার চেয়ে শুভ্র, তার ঘ্রাণ মিশক-এর চেয়ে সুগন্ধিযুক্ত এবং তার পাত্রের পরিমাণ আসমানের তারকার ন্যায়। যে লোক তা থেকে পান করবে, সে তারপরে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত এই হাওযের কাছে আসবে। এক ব্যক্তিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে রব! সে আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি জানেন না যে, আপনার পরে এরা কত নতুন আমল তৈরি করেছে’।[৩] আর প্রত্যেক নবীর জন্যই হাওয থাকবে। তার উম্মতের সৎ ব্যক্তিগণ সেখান থেকে পানি পান করবে। নবী ﷺ বলেছেন, ‘প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাওয হবে। আর এ নিয়ে তারা পরস্পর গর্ববোধ করবেন যে, কার হাওযে কত বেশি লোক অবতরণ করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাওযেই

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৯২।

www.al-itisam.com

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক আসবে'।[৪] তারপর মানুষজন দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তখন তাদের এমন দুশ্চিন্তা ও সংকট দেখা দিবে, যা তারা বহন করতে সক্ষম নয়। তখন তারা বলবে, তোমাদের অবস্থা তো তোমরা দেখছই। তোমরা কি এমন একজনের কাছে যাবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের কাছে সুপারিশ করবেন? তখন কিছু মানুষ বলবে যে, তোমরা আদমের কাছে যাও। তখন তারা আদম আলাইহিস সালাম-এর কাছে আসবে। তারপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে আসবে। সকলেই বলবে যে, আমি এর যোগ্য নই। তারপর তারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে আসবে।

তখন তিনিও বলবেন যে, আমি এর যোগ্য নই। বরং তোমরা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাও। তখন তারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসবে, যাতে সৃষ্টির বিচার শুরু করা হয়। মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদম সন্তান এবং সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, তারা সকলে আমার কাছে আসবে। তখন আমি বলব, আমিই এর উপযুক্ত। আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। তিনি আমাকে অনুমতি দিবেন। আর তিনি আমার কাছে এমন কিছু প্রশংসার বাণী ইলহাম করবেন, যেগুলো দিয়ে আমি তার প্রশংসা করব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার মাথা তুলুন, আপনি বলুন, আপনার কথা শোনা হবে। আপনি চান, আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোনো হিসাব হবে না, তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। তারা অন্য মানুষদের সাথে অন্য দরজা দিয়েও যেতে পারবে। এটিই হবে প্রথম ও সর্ববৃহৎ সুপারিশ। তারপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির বিচার করার জন্য আসবেন। পুরো যমীন তাঁর নূরে আলোকিত হয়ে যাবে। তারপর আমলসমূহকে পেশ করা হবে এবং আমলনামা দেওয়া হবে। তাতে ছোট বড় সকল কিছুই লিখা থাকবে। ছোট বড় কোনো পাপই বাদ দেওয়া হবে না। বরং সকল কিছুই সংরক্ষণ করা থাকবে। হিসাবের ভয়ে সকল উম্মতকে নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে নিকটে ডাকবেন। তারপর তার পাপগুলো স্বীকার করাবেন। যখন সেই ব্যক্তি দেখবে যে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি দুনিয়াতে এগুলো গোপন রেখেছিলাম। আর আজকেও তোমাকে মাফ করে দিলাম। তারপর তাকে তার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। ফলে সে সৌভাগ্যবান হবে এবং অত্যন্ত আনন্দিত হবে। যার সাথেই তার সাক্ষাৎ হবে, তাকেই সে বলবে, নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। সুউচ্চ জান্নাতে *(আল হাক্কাহ, ৬৯/১৯-২২)*।

আমি যা বললাম, তা আপনারা শুনলেন। আমি আমার ও আপনাদের জন্য সকল পাপ থেকে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করছি। আপনারাও তারই কাছে ইস্তেগফার করুন। কারণ নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, দয়াবান।

দ্বিতীয় খুৎবা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় বিচারের দিন সুনির্ধারিত' *(সূরা নাবা, ৭৮/১৭)*। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই, তার কোনো শরীক নেই । আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। ছালাত ও সালাম নাযিল হোক তার ওপর, তার পরিবার-পরিজন ও সকল ছাহাবীর ওপর। অতঃপর, হে মুসলিমগণ! আপনারা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করুন, তাঁরই আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্য হয়েন না।

হে মুসলিমগণ! কিয়ামতের দিন মীযান বা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, যাতে অণু পরিমাণ ভালো-মন্দও ওযন করা হবে। কোনো বান্দার নেকীর পাল্লা হালকা হবে অথবা কোনো বান্দার নেকীর পাল্লা ভারী হবে। সেদিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, যে যার ইবাদত করছিলে, সে যেন তার অনুসরণ করে। তারপর যারা সূর্যের ইবাদত করত, তারা সূর্যের অনুসরণ করবে। যারা চন্দ্রের ইবাদত করত, তারা চন্দ্রের অনুসরণ করবে। আর যারা ত্বাগূতদের পূজা করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। তারপর যারা শুধু আল্লাহর ইবাদত করত এমন পুণ্যবান এবং পাপীরা অবশিষ্ট থাকবে। বিশ্বজাহানের রব তাদের কাছে আসবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পায়ের গোছা বের করে দিবেন। তখন যারা আল্লাহর জন্য সিজদা করত, তারা সকলেই সিজদা করবে। কিন্তু যারা লোক দেখানোর জন্য করত, তাদের পিঠ শক্ত কাঠের মতো হয়ে যাবে। যখনই তারা সিজদা দিতে যাবে, তখনই তারা উলটা হয়ে পড়ে যাবে।

[প্রবন্ধটির বাকী অংশ ৩৭ নং পৃষ্ঠায়]

৪. তিরমিযী, হা/২৪৪৩।

ধূমপান : ধ্বংসের কারণ

-আবূ রায়হান বিন জাহিদুল ইসলাম*

ধূমপান একটি মরণব্যাধি। বর্তমানে এর কারণে ধূমপায়ী ব্যক্তিসহ আশেপাশের মানুষজন সাথে পরিবেশের ভারসাম্যও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু তা কীভাবে? এই নিবন্ধে সংক্ষেপে তা জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ধূমপান করলে কী হবে?

'যক্ষ্মা হবে এ পর্যন্তই'। 'ক্যান্সার হবে আর কী?' 'আরে সকলের ক্যান্সার হয় না-কি!' 'কতজন তো ধূমপান করে!' এ রকম আরো অনেক কথা আমরা প্রায় শুনতে পাই ধূমপায়ীদের কাছ থেকে। আমরা শুধু এটুকু জানি যে, ধূমপান করলে যক্ষ্মা, ক্যান্সার হয়। প্রকৃতপক্ষে কি ক্যান্সার পর্যন্তই শেষ? আসুন, এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

'ধূমপান' শব্দটি 'ধূম' এবং 'পান' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। ধূম হলো ধোঁয়া বা বাষ্পের প্রতিশব্দ। যেহেতু তামাকজাতীয় পদার্থের ধোঁয়া গ্রহণ করা বা পান করা হয়, তাই একে ধোঁয়া পান বলা হয়।

ধূমপান হচ্ছে তামাকজাতীয় দ্রব্যাদির বিশেষ উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শ্বাসের সাথে তার ধোঁয়া শরীরে গ্রহণের প্রক্রিয়া। সাধারণ যে কোনো দ্রব্য পোড়ানো ধোঁয়া শ্বাসের সাথে প্রবেশ করলে তাকে ধূমপান বলা হলেও মূলত তামাকজাতীয় দ্রব্যাদি পোড়ানো ধোঁয়া গ্রহণকেই ধূমপান বলা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সিগারেটের ধূমপানে নিকোটিনসহ ৫৬টি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বিরাজমান।[১]

ধূমপানের প্রকারভেদ :

ধূমপান দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : (১) সক্রিয় ধূমপান (২) নিষ্ক্রিয় ধূমপান।

(১) সক্রিয় ধূমপান : ধূমপায়ী যে অবস্থায় জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি থেকে উদ্ভূত ধোঁয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে টেনে সরাসরি ফুসফুসে প্রবেশ করায়, তাকে সক্রিয় ধূমপান বলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, পৃথিবীতে প্রতি বছর ৬ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে ধূমপানজনিত কারণে।[২] এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি বছর ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ২৫৩ জন।[৩]

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে যদি জরুরী ব্যবস্থা গৃহীত না হয়, তবে আগামী কয়েক দশকে এর হার দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। সর্বশেষ পরিসংখ্যাণ (২৯ এপ্রিল, ২০২১) অনুযায়ী বিশ্বে করোনায় মোট মৃত্যু ৩১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৫৪ জন।[৪] এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেছে ১১২২৮ জন।[৫] তাহলে এখানে একটু চিন্তা করুন যে, কোনটি বেশি মারাত্মক? ধূমপান নাকি করোনা? প্রশাসনের উচিত, করোনার বিধিনিষেধের চেয়ে আরো কঠোর নিয়ম ধূমপানের ক্ষেত্রে করা।

(২) নিষ্ক্রিয় ধূমপান : ধূমপানের সময় ধোঁয়ার যে অংশ চারপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষের দেহে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে, তাকে নিষ্ক্রিয় ধূমপান বলে। মানুষের মধ্যে অন্যের ধূমপানের (পরোক্ষ ধূমপান) প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ মারা যায়।[৬] এর মধ্যে ১ লক্ষ ৬৫ হাজারই হলো শিশু।[৭] শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের কারণে নিউমোনিয়া ও এ্যাজমায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগও দেখা যায়। গবেষণায় এটিও বেরিয়ে এসেছে যে, পরোক্ষ ধূমপান পুরুষের তুলনায় নারীর উপর বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৮১ হাজার নারী মৃত্যুবরণ করে। এর আগে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত এ জাতীয় আরেকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যে, পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার ব্যক্তিদের ৪০% শিশু, ৩৩% অধূমপায়ী পুরুষ এবং ৩৫% অধূমপায়ী নারী রয়েছে।[৮] অর্থাৎ বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে কেউ ধূমপান করলে তার আশপাশের ব্যক্তিদেরও নিশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। বিআরটিএ এবং বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মতে ঢাকা থেকে সারা দেশে প্রায় ৩০ হাজার আন্তঃজেলা বাস চলাচল করে। যার মধ্যে প্রচুর সংখ্যক যাত্রী থাকে, কমলাপুর রেল স্টেশনে একটি তাৎক্ষণিক সমীক্ষা থেকে

---

* ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর.পি.আই।

১. উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত।

২. দৈনিক ইনকিলাব, ১০ এপ্রিল ২০২১।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. জন্স হপকিন্স ৩৬ ইউনিভার্সিটি, corona.gov.bd, ২৯ এপ্রিল ২০২১।

৫. স্বাস্থ্য অধিপ্তর, corona.gov.bd, ২৭ এপ্রিল ২০২১, বিকাল ৪ : ৫৮।

৬. উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত; দৈনিক ইনকিলাব, ১০ এপ্রিল ২০২১।

৭. উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত।

৮. প্রাগুক্ত।

জানা যায় যে, এই স্টেশন দিয়ে গড়ে প্রতিদিন ৫০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করে। একইভাবে রাজধানী ঢাকায় ১৬৮টি রুটে ৪৫০০টি পাবলিক বাস চলাচল করে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায়।[৯]

ফলস্বরূপ ধূমপায়ীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অসংখ্য অধূমপায়ী ব্যক্তি পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাবের স্বীকার হতে হচ্ছে। গ্যাটস সার্ভে ২০১৮ অনুযায়ী প্রায় ৪৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পাবলিক পরিবহনের চলাচলের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে।[১০] যদিও বাংলাদেশের আইনে পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ।

ধূমপানের ক্ষতিকর দিক :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী, ধূমপান যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ নানা ধরনের মারাত্মক রোগের প্রধান কারণ। এর ক্ষতিকর কিছু দিক-

(১) ক্যান্সার উৎপাদনে ধূমপানের প্রভাব : সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী মিউটাজেন থাকে। এরা মানুষের মুখ, শ্বাসনালী, গ্রাসনালী এবং ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

(২) ব্রংকাইটিস : ধূমপান থেকে শ্বাসনালীতে প্রদাহ এবং কাশির সৃষ্টি হয়, একে ব্রংকাইটিস বলে। এতে শ্বাসনালী ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়। হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি হয়, ফুসফুস অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় হয়।

(৩) এমফাইসিমা : ধূমপানের ফলে শ্বাসনালীগুলোর বায়ুপথসমূহ সরু হয় এবং ফুসফুসে অতি স্ফীত দেখা দেয়। এতে এমফাইসিমা বলে। এর ফলে ফুসফুসে জটিল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

(৪) উদগারি কাশি : ধূমপানের জন্য অনেকের প্রচণ্ড কাশি এবং কাশির সাথে ফুসফুস থেকে মিউকাশ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, একে উদগারি কাশি বলে।[১১]

(৫) সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ : জার্মানীর সারলান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ধূমপায়ীদের বীর্যকোষের জিনমের মেমব্রেনে পরিবর্তন প্রমাণ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ যে পুরুষ সন্তানের পিতা হতে চান, তাকে ধূমপান এড়িয়ে চলা উচিত। বায়োক্যামিস্টিক অধ্যাপক মাটিয়াস মন্টেনার বলেন, সিগারেটের ধোঁয়ায় এমন পদার্থ থাকে, যা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জিনম পরিবর্তন করে, ফলে তা আর ডিম্বাণুকে নিসিক্ত করতে পারে না। তাছাড়া বীর্যের আকার, ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছানোর গতি বদলে দেয়। ফলে স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এ কারণে অনেক ধূমপায়ী সন্তানের জন্ম দিতে পারে না।[১২]

ধূমপানের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো এবং নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সৎ কর্ম করো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালোবাসেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৫)*।

ধূমপানের ক্ষতিকর দিক এবং ধূমপানের মাধ্যমে নিজেকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘প্রত্যেক নেশাদার বস্তু হারাম’।[১৩] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সকল প্রকারের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম।[১৪] হাদীছ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যেটা বেশি গ্রহণ করলে নেশা হয়, সেটার অল্প গ্রহণ করাও হারাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়’।[১৫] যে মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম ধূমপান। এছাড়াও ধূমপান ক্ষুধা নিবারণ করে না বা উপকারও করে না। সুতরাং এটি একটি অপচয়। আর এই অপচয়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ ‘নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/২৭)*।

ধূমপান ত্যাগ করার উপায় :

ধূমপান থেকে মুক্তির কয়েকটি উপায় নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) আজ থেকেই ধূমপান ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করুন। কেউ যদি সত্যি ধূমপান থেকে নিবৃত হতে চায়, তাহলে হৃদয়ে এই বিশ্বাস আনা জরুরী যে, ইসলামে ধূমপান হারাম। আর কেউ যদি জেনে-বুঝে হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে যেন

৯. দৈনিক ইনকিলাব, ১০ এপ্রিল ২০২১।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত।
১২. Dw, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬১২৪।
১৪. ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৮৭, তিরমিযী, হা/১৮৬৪।
১৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৮।

নিজেকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে ঠেলে দেয়। সাথে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসলাম যা কিছু নিষিদ্ধ করেছে, তাতে অবশ্যই মানুষের ক্ষতি রয়েছে।

(২) ধূমপান হারাম— এ বিশ্বাস পোষণের পর যা করণীয়, তা হলো- একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার জন্য মনের মধ্যে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কারণ সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের কাছে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবৃত্তির হাতছানি ও শয়তানের কূটকৌশল পরাভূত হতে বাধ্য।

(৩) এ পথ থেকে ফিরে আসার জন্য মহান রবের কাছে আন্তরিকভাবে দু'আ করা। কারণ আল্লাহ মানুষের অন্তরের নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি যদি মনকে হারাম থেকে ঘুরিয়ে দেন, তাহলে তা আর সেদিকে মোড় নিবে না।

(৪) প্রচুর পরিমাণে যিকির-আযকারের মাধ্যমে জিহ্বাকে সতেজ রাখা। কারণ যিকির দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়। আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখো আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*। সুতরাং যারা হতাশা, অস্থিরতা, ব্যর্থতা ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ধূমপান করে মনে শান্তি খোঁজেন, তাদের উচিত- এসব হারাম থেকে তওবা করা এবং আল্লাহর যিকিরের প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই অন্তরে অনাবিল শান্তি লাভ করবে।

(৫) ধূমপান করে এমন বন্ধুর সঙ্গ এড়িয়ে চলুন। ভালো বন্ধুর সাথে মেশার চেষ্টা করুন। প্রবাদে আছে— 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' অথবা 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে'। সুতরা ভালো বন্ধুর সাথে চলার চেষ্টা করুন।

(৬) মনের মধ্যে ধূমপান করার ইচ্ছা জাগ্রত হলেই আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম পাঠ করুন।

(৭) ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো স্মরণ করুন। (যেগুলো প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে)

(৮) যারা ধূমপান ত্যাগ করেছে, তাদের পরামর্শ নিন।

(৯) অনেকে পত্রিকা বা বই পড়ার সময় সিগারেট পান করে, এক্ষেত্রে সিগারেটের জায়গায় চা বা কফি আনুন।

(১০) মটিভেশনাল ভিডিও অথবা ভালো বই পড়ুন।

আমাদের আহ্বান : সমাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ম করে আপনি, আমি বা আমরা পরোক্ষভাবে ধূমপানের বিপক্ষে অর্থাৎ ধূমপানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধসহ প্রতিকার করতে পারি। যা শুরু হতে পারে সমাজ, পাড়া, মহল্লা, থানা, উপজেলা, জেলা বিভাগ ক্রমানুসারে দেশ পর্যায়ে। যারা প্রশাসনে আছেন, সবার আগে তাদের ধূমপান বন্ধ করার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে বিজ্ঞাপন, আর্টিকেলসহ এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জনগণের কাছে প্রচার করতে হবে। মসজিদের খত্বীব, বক্তা, আলোচকগণ খুৎবা, মাহফিল বা বিভিন্ন আলোচনা সভাতে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে প্রচার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কঠিন করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস-ট্রাক, লঞ্চ টার্মিনাল, রেল স্টেশনসহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় মোবাইল কোর্ট বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভুক্তভোগী খুব সহজেই অভিযোগ করতে পারে।

পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের ধূমপানসহ যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য থেকে হেফাযত করেন- আমীন!

লঞ্চ দুর্ঘটনা : কারণ ও সুপারিশ

-জুয়েল রানা*

সম্প্রতি ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে ঢাকা থেকে বরগুনাগামী ‘এমভি অভিযান-১০’ লঞ্চে আগুন লেগে ৪৪ যাত্রী দগ্ধ হয়ে মারা যান। আরও অন্তত ১০০ দগ্ধ যাত্রীকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কতজন নিখোঁজ রয়েছেন, তা এখনও জানা যায়নি। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, এ লঞ্চের ধারণক্ষমতা ছিল ৪২০ জন। ভুক্তভোগী যাত্রীদের ভাষ্য অনুযায়ী, লঞ্চে যাত্রীসংখ্যা ছিল ৭০০-৮০০ জন। যাত্রার সময় সদরঘাটে রক্ষিত রেজিস্টারে উল্লেখ করা হয়েছে ৩১০ জন।

মৃতের সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে ২০০৩ সালের ৮ জুলাই। ঢাকা থেকে লালমোহনগামী ‘এমভি নাসরিন-১’ চাঁদপুরের ডাকাতিয়া এলাকায় অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল বোঝাইয়ের কারণে পানির তোড়ে তলা ফেটে যায়। তাতে দুই সহস্রাধিক যাত্রীসহ লঞ্চটি ডুবে যায়। ওই দুর্ঘটনায় সরকারি ভাষ্যমতে, উদ্ধারকৃত মৃতদেহ ৬৪১টি। কিন্তু বেসরকারি হিসাবে প্রায় ৮০০টি। ২০০২ সালের ৩ মে চাঁদপুরের ষাটনল সংলগ্ন মেঘনায় ডুবে যায় ‘এমভি সালাউদ্দিন-২’ নামে একটি যাত্রীবাহী লঞ্চ। এতে ৩৬৩ যাত্রী মারা যান। ২০০৫ সালে ‘এমএল মিতালি’ ও ‘এমএল মজলিশ’ নামে দুটি ছোট লঞ্চের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর ডুবে গিয়ে প্রায় ৩০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৮৬ সালে ‘অ্যাটলাস স্টার’ নামে একটি লঞ্চ ডুবে ২০০ যাত্রী মারা গিয়েছিল। লঞ্চটি ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে ডুবে গিয়েছিল বলে জানিয়েছিল বিআইডব্লিউটিএ। ২০০০ সালের ২৯ ডিসেম্বর ঈদুল আযহার রাতে চাঁদপুরের মতলব উপজেলার ষাটনল এলাকায় মেঘনা নদীতে ‘এমভি জলকপোত’ এবং ‘এমভি রাজহংসী’ নামে দুটি যাত্রীবাহী লঞ্চের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ‘রাজহংসী’ লঞ্চটি পানিতে তলিয়ে যায়। ওই দুর্ঘটনায় লঞ্চের ১৬২ যাত্রী নিহত হয়েছিল। এ ছাড়া ২০০৫ সালে একটি ফেরি ডুবে গিয়ে ১১৮ যাত্রী নিহত হয়।

লঞ্চ দুর্ঘটনার কারণ অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন, ঘূর্ণিঝড়, নির্মাণ ও যান্ত্রিক ত্রুটি, লঞ্চে লঞ্চে পাল্লা, মুখোমুখি সংঘর্ষ, মাস্টারের গাফিলতি, ডুবোচরে আটকানো ইত্যাদি। কিন্তু **লঞ্চে আগুন লাগার ঘটনা বাংলাদেশে লঞ্চ দুর্ঘটনার ইতিহাসে এই প্রথম।** পত্রিকান্তরে প্রকাশ, লঞ্চের মালিক গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় কমিয়ে আনার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নতুন রিকন্ডিশন্ড ইঞ্জিন লাগিয়েছেন। তা ছাড়া ওই লঞ্চে কর্মরতদের গাফিলতি ছিল। আগুন লাগার পরও তারা লঞ্চটি তীরের দিকে না চালিয়ে গন্তব্যের দিকে চালাচ্ছিল। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। জাতিকে ৪৪টি তাজা প্রাণ পুড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে হয়েছে। ৪৪টি পরিবারের যে ক্ষতি, তা কখনও পূরণীয় নয়।

যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য একটি লঞ্চে থাকা উচিত লাইফ জ্যাকেট বা লাইফ বয়া, অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম। বাকেটে পানি বা বালি ইত্যাদি লঞ্চে থাকলেও সেটি এমনভাবে ছিল যে, আগুন লাগার সময় যাত্রীরা ব্যবহার করতে পারেনি। এসব জননিরাপত্তামূলক বিষয় দেখার দায়িত্ব কার? নৌপরিবহন অধিদপ্তরের দায়িত্বশীলরা কোনোক্রমেই এর দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের দুঃখ-কষ্ট দেখলে হৃদয় ভেঙে যায়। পরিবারের সদস্যদের আহাজারিতে ঝালকাঠির আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছে। কত লোক পোড়ার ক্ষত নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় হাসপাতালের বেডে শুয়ে কাতরাচ্ছেন! তাদের দুঃখ-কষ্টের মূল্য ধার্য হয়েছে সরকার ঘোষিত কিছু অর্থ। মালিক ও অন্যান্য কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিছুদিন পর জামিনে তারা বেরিয়ে যাবে। বিচারের আশায় ভুক্তভোগী মানুষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবেন আজীবন। আর অনেক পরিবার তাদের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে রয়েছেন।

বাংলাদেশে বড় একটি সমস্যা হলো ওভারলোডিং। বাস, ট্রেন, লঞ্চ স্টেশন যেখানেই যাই না কেন, দেখা যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। এ দেশটি বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দিপাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

জনসংখ্যার দেশ। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১ হাজার ২০০ জন। কিছু দ্বীপ ও নগররাষ্ট্র বাদে জনসংখ্যার এই ঘনত্ব পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। ফলে বিভিন্ন যানবাহনে মানুষ চলছে গাদাগাদি করে। একারণে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে হতাহতের সংখ্যাও অধিক হয়।

কিন্তু কে শুনে কার কথা? হুড়াহুড়ি ও ঠেলাঠেলি করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীরা উঠে পড়ে। এটা নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক সময় র‍্যাব-পুলিশও ডাকা হয়। এটা কি যাত্রীসাধারণের অসচেতনতা, না-কি বিদ্যমান পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটি? আসলে এখানে উভয় কারণই জড়িত। লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের পিছনে কিছু কৃত্রিম কারণও সক্রিয়, যে ব্যাপারে আমাদের চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। যাত্রীদের সচেতন হতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু যে সকল নিয়মকানুন রয়েছে, তার ব্যত্যয় হবে কেন? লঞ্চের কেবিন, চেয়ার ও সাধারণ ডেকে যে সংখ্যক যাত্রী যেতে পারে, তার অতিরিক্ত যাত্রী যাতে উঠানো না হয়, তা দেখভাল করার জন্য বিআইডব্লিউটিএর পরিদর্শকগণ রয়েছেন। তারা কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন? দেখা যায়, মূল ঘাট হতে লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার পর মাঝপথে অন্যান্য ঘাটেও যত্রতত্র যাত্রী উঠানো হয়। পরিদর্শকরা হয়তো বলবেন, যাত্রীদের এত ভিড় যে, তা সামাল দেওয়া কঠিন। তা হলে দেখতে হবে কেন ভিড় হচ্ছে এবং সাপ্লাই ও ডিমান্ডের সূত্র কেন কাজ করছে না।

যদি যাত্রীদের চাহিদা অধিক থাকে, তা হলে নতুন নতুন লঞ্চ সরবরাহ করা হবে না কেন? নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে যাত্রীবাহী নৌযান (লঞ্চ) ও মালবাহী নৌযান রয়েছে যথাক্রমে ৮৩৯ ও ৪ হাজার ৮৮টি। শুধু সদরঘাট হতে ৪৪টি নৌ-রুটে চলছে ২২২টি লঞ্চ। কিন্তু গত এক দশকে চাহিদা অনুযায়ী কি লঞ্চ বেড়েছে? তা ছাড়া পৃথক পৃথক নৌ-রুটে যতগুলো লঞ্চ চলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে চলছে তারও কম। যেমন— ঢাকা-বরিশাল রুটে ১৭টি লঞ্চ চলার কথা, কিন্তু নিয়মিত চলছে ছয়-সাতটি। অনুরূপভাবে ঢাকা-ভোলায় ছয়টির মধ্যে চারটি এবং ঢাকা-ভাণ্ডারিয়ায় ৯টির স্থলে চারটি যাতায়াত করছে। রোটেশন পদ্ধতির মারপ্যাঁচে পড়ে প্রয়োজন ও সক্ষমতার তুলনায় কম লঞ্চ চলছে। ফলে যাত্রীদের ভিড় বাড়ছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, চালকদের অশুভ প্রতিযোগিতা, নৌ-পথে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর না করা, লঞ্চ চালকদের দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা, অদক্ষতা, ফিটনেসবিহীন লঞ্চ চলাচল করার ‘সুযোগ’ পাওয়াসহ লঞ্চে ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করাই যে লঞ্চ দুর্ঘটনা বা লঞ্চডুবির অন্যতম প্রধান কারণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লঞ্চ দুর্ঘটনা বা লঞ্চ ডুবির ঘটনা এদেশে নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রায় প্রতি বছরই লঞ্চডুবিতে অনেক মানুষ আহত, নিহত বা নিখোঁজ হন। শুরু হয় স্বজন হারানো ব্যক্তিদের আহাজারি। এ নিয়ে কিছুদিন হৈ চৈ হয়। গণমাধ্যমগুলোতে ফলাও করে খবর প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। তখন সংশ্লিষ্টরা বলে থাকেন, ঘটনার সাথে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্যাস, হয়ে গেল। এর কিছুদিন পরেই দেশে যেই ঘটে অন্য একটি বড় ঘটনা, তখন চাপা পড়ে যায় লঞ্চডুবি বা নৌ-দুর্ঘটনার ঘটনা। ফলে তখন আর কেউ জানতেও পারে না আগের ওই লঞ্চডুবির পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আদৌ নেওয়া হয়েছে কি না, কিংবা লঞ্চ ডুবির ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আদৌ আলোর মুখ দেখেছে কি না? এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

উন্নয়নশীল দেশে হাজারো সমস্যা থাকবেই। কিন্তু সেই সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে যে ফারাক সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে হবে।

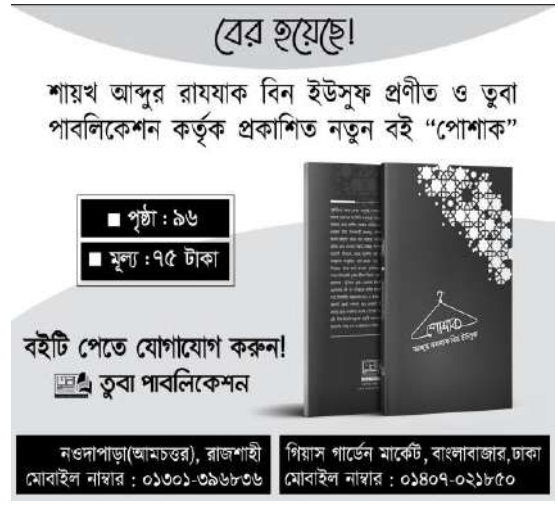

বন্ধু আমার! পাপ করো না, পাপ হয়ে গেলে তওবা করতে ভুলো না

-জাবির হোসেন*

বন্ধু আমার! পাপ করো না। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পাপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাকে মানুষরূপে এই ধরাতে পাঠিয়েছেন। তুমি তাঁর ইবাদত করবে— এটাই তোমার প্রতিপালকের চাওয়া। তোমার জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে যে, তুমি সৃষ্টি হিসাবে স্রষ্টার আনুগত্য করবে। তুমি কি জানো, মহান আল্লাহ তোমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? তোমার সৃষ্টিকর্তা জানিয়েছেন, 'আমি জিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*। তুমি মহান আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধ মেনে চলবে— এটিই ইবাদত। পক্ষান্তরে, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, তুমি যদি তাঁর অবাধ্য হও— তাই হলো পাপ।

বন্ধু আমার! তুমি কি জানো, পাপ কী? পাপ হলো, মহান প্রতিপালকের নিয়ম লঙ্ঘন করলে যা হয়, শরীআত ও সুস্থ বিবেক অনুযায়ী যা বর্জন করা আবশ্যক, তা সম্পাদন করার নাম পাপ। শরীআতে যে কাজের শাস্তি ইহকালে ও পরকালে নির্ধারিত হয়েছে, তা করাই পাপ। যে কাজ মহান প্রতিপালক করতে নিষেধ করেছেন, তা করা এবং যা করতে আদেশ করেছেন, তা না করাই পাপ। যে কাজ করলে জাহান্নাম যেতে হবে অথবা আল্লাহর গযব ও শাস্তি নেমে আসে অথবা তার অভিশাপ আসে অথবা তাঁর রাসূল ﷺ বা মানুষের অভিশাপ দেয়, তাই পাপ বা গুনাহের কাজ। শরীআতে যা হারাম করা হয়েছে, তা সংঘটিত করাই পাপ। এমনকি যে কাজ করতে গেলে মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় বা অপরাধবোধ জগ্রত হয় বা গোপনীয়তা অবলম্বন করতে মন চায়, করা উচিত হচ্ছে না এরূপ ভাবনা মনে খটকা দেয়, তাই পাপ।[১]

বন্ধু আমার! গুনাহ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) ছাগীরা গুনাহ, যাকে সায়্যেয়াতও বলা হয় (২) কাবীরা গুনাহ, যাকে মুবিকাত তথা ধ্বংসকারীও বলা হয়।[২]

আবার কেউ কেউ কাবীরা গুনাহকে দুটি উপভাগে বিভক্ত করেছেন। তারা মোট তিন প্রকার পাপের কথা বলেছেন। যেমন : (১) অতি মহাপাপ (আকবারুল কাবায়ের), যেমন : শিরক, তাওহীদবাদী না হওয়া, কুফরী, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী বলে অস্বীকার করা, কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার না করা, ফেরেশতাকে অবিশ্বাস করা, ভাগ্য অস্বীকার করা ইত্যাদি। (২) মহাপাপ (কাবীরা গুনাহ), যেমন : ব্যভিচার করা, হত্যা করা, চুরি করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি। (৩) উপপাপ বা লঘুপাপ (ছাগীরা গুনাহ), যেমন: বিবাহ হারাম নয় এমন নারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো বা মুছাফাহ বা স্পর্শ করা ইত্যাদি।[৩]

বন্ধু আমার! পাপ আমাদের জীবনের বড় অভিশাপ। পাপ থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন আমাদের প্রভু। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপকার্য পরিত্যাগ করো, যারা পাপের কাজ করে, তাদেরকে অতিসত্বরই নিজেদের কৃতকার্যের প্রতিফল দেওয়া হবে' *(আন-আনআম, ৬/১২০)*। হাদীছেও এসেছে, 'তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থাকো'।[৪]

বন্ধু আমার! পাপ করলে তার শাস্তি পেতে হবে। তুমি কি জানো, পাপের পরিণতি কী? পাপের আসল শাস্তি হবে পরকালে। ইহকালেও কিছু অপরাধের শাস্তির বিধান আছে, কিন্তু সকলকে তা দেওয়া হয় না। দেশীয় আইনের ফাঁক-ফোকর তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু, মনে রেখো— পরকালে অপরাধীদের শাস্তি পেতেই হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে মন্দ কাজ করবে, সে তার প্রতিফল পাবে' *(আন-নিসা, ৪/১২৩)*।

---

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. আব্দুল হামীদ মাদানী, পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায় (তাওহীদ প্রকাশনী-বর্ধমান), পৃ. ১-২।

২. মূল : হাফেয ইবনু আহমাদ আল-হাকামী, অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী, নাজাতপ্রাপ্ত দলের আকীদাহ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), পৃ. ২৩৬।

৩. আবদুল হামীদ মাদানী, তাওহীদ (তাওহীদ প্রকাশনী-বর্ধমান), পৃ. ৮৮।

৪. আহমাদ, হা/২২৮০৮, হাদীছ ছহীহ; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/২৪৭১।

www.al-itisam.com

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, ‘অবশ্যই যে ব্যক্তি পাপ করেছে এবং যার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করেছে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/৮১)*।

হ্যাঁ— বন্ধু! পাপের পরিণতি হলো ‘জাহান্নাম’। জাহান্নাম পরকালের এক নিকৃষ্টতম বাসস্থান। যা আল্লাহ তাআলা ধর্মদ্রোহী, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, অবিশ্বাসী, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক্ব এবং পাপীদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। যেখানে তারা স্ব স্ব কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ প্রতিফল ভোগ করবে।[৫]

বন্ধু আমার! তুমি তো পাপ সম্পর্কে এবং পাপের প্রকারভেদ ও তার পরিণতি সম্পর্কেও জানলে। তাই তোমার কাছে অনুরোধ, কোনো পাপকে হালকা বা তুচ্ছ মনে করো না! এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীছ শোনো—

(১) নবী ﷺ বলেন, ‘তোমরা নগণ্য ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান হও! নগণ্য ছোট ছোট গুনাহগুলোর উদাহরণ হলো ঐ লোকদের মতো যারা কোনো মাঠে বা প্রান্তরে গিয়ে অবস্থান করল এবং তাদের প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে লাকড়ি (জ্বালানি কাঠ) সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত এতটা লাকড়ি তারা সংগ্রহ করল যা দিয়ে তাদের খাবার পাকানো হলো। নিশ্চয় নগণ্য ছোট ছোট গুনাহতে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের যখন সেই নগণ্য ছোট ছোট গুনাহগুলো গ্রাস করবে (পাকড়াও করবে) তখন তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে’। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, ‘তোমরা নগণ্য ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান হও; কেননা সেগুলো মানুষের কাঁধে জমা হতে থাকে, অতঃপর তাকে ধ্বংস করে দেয়’।[৬]

(২) ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঈমানদার ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে এত বিরাট মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নিচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহগুলোকে মাছির মতো মনে করে, যা তার নাকে বসে, আবার চলে যায়’।[৭]

(৩) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, ‘তোমরা এমন সব কাজ করে থাকো, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও চিকন। কিন্তু নবী ﷺ-এর সময়ে আমরা এগুলোকে ধ্বংসকারী মনে করতাম’।[৮]

বন্ধু আমার! তুমি তো জেনেছ যে, পাপ বা গুনাহ দুই প্রকার। যথা : কাবীরা গুনাহ ও ছাগীরা গুনাহ। কিন্তু তুমি কি জানো, কাবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা কী? হ্যাঁ— মর্যাদা আছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা যদি সে সব কাবীরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের (ছাগীরা বা ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো’ *(আন-নিসা, ৪/৩১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘যারা ছোটখাটো অপরাধ ছাড়া কাবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব অপরিসীম ক্ষমাশীল’ *(আন-নাজম, ৫৩/৩২)*। হাদীছেও এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং জুমআর ছালাত হতে পরবর্তী জুমআর ছালাতে তার মাঝখানে সংঘটিত (ছোটখাটো) গুনাহসমূহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়; তবে শর্ত হলো কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে হবে’।[৯]

তাহলে বন্ধু, তুমি জানতে পারলে কাবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কী মর্যাদা। এখন প্রশ্ন করতে পার, কাবীরা গুনাহ কী বা কোনগুলো কাবীরা গুনাহ? বন্ধু আমার! কাবীরা গুনাহ হলো, যে সকল গুনাহের ব্যাপারে ইসলামী শরীআতে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যে সকল গুনাহের ব্যাপারে দুনিয়াতে নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। যে সকল কাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাগ করেন। যে সকল কাজে আল্লাহর নবী ﷺ ও ফেরেশতামণ্ডলী লা‘নত বা অভিসম্পাত দেন। যে কাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে এমনটি করবে সে মুসলিমদের দলভুক্ত নয়। কিংবা যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করা হয়েছে। যে কাজে দ্বীন নেই, ঈমান নেই ইত্যাদি বলা হয়েছে। অথবা যে কাজকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০]

বন্ধু আমার! কাবীরা গুনাহের কোনো সুনির্দিষ্ট তালিকা কুরআন ও হাদীছে একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আসেনি।

৫. তাওহীদ, পৃ. ৬৭।
৬. আহমাদ, হা/৩৮১৮, ‘হাসান লি-গায়রিহি’।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৮।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৯২।
৯. সুনানে তিরমিযী, হা/২১৪, হাদীছ ছহীহ।
১০. একশত কাবীরা গুনাহ, পৃ. ৩।

www.al-itisam.com

বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছ গবেষণা করে 'আলেমগণ' কাবীরা গুনাহের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রহিমাহুল্লাহ। তিনি তার কিতাব 'আল-কাবায়ের'-এর মধ্যে অর্ধশতাধিক কবীরা গুনাহের তালিকা দিয়েছেন। সম্প্রতি সঊদী আরবের বিখ্যাত আলেম 'শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ আত-তুয়ায়জিরী' একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন, যা তাঁর রচিত ইসলামী ফিক্বহ বিশ্বকোষের ১৬তম পর্বে 'কিতাবুল কাবায়ের' নামে উল্লেখিত হয়েছে।[১১]

বন্ধু আমার! এতক্ষণ তো আমরা পাপ নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু আমরা তো মানুষ। মহান আল্লাহ আমাদের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। যার সাহায্যে আমরা ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারি। সেই ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে স্রষ্টার বাধ্য হয়ে জান্নাত যেতে পারি; আবার স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে যেতে পারি। এখন নিজেকে ঠিক করতে হবে, আমরা নিজেকে কোথায় দেখতে চাই। —জান্নাতে না-কি জাহান্নামে?

বন্ধু আমার! আমরা মানুষ। তাই আমাদের দ্বারা ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। মানুষ মাত্রই তো ভুল হয়— একথা তুমি আমি সবাই জানি। ফেরেশতারা কিন্তু ভুল করেন না। সেই শক্তি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের দেননি। দিয়েছেন মানুষকে। তাই মানুষ পাপ করবে না মনে করলেও, নানা কারণে মনের অবচেতনে পা পিছলে পাপে গিয়ে পড়ে। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাই ছিল মানুষ পাপ করবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিশীল ও অপরাধী, আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক তারা, যারা তওবা করে'।[১২]

তার সকল সৃষ্টি তাঁর গুণগান গায়। ফেরেশতাকুল তার ইবাদতে সদা মশগূল। তবুও তিনি চেয়েছেন এমন এক সৃষ্টি, যারা ভুল করবে, অতঃপর তারা তার কাছে বিনয় সহকারে ভুল স্বীকার করবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ক্ষমা প্রার্থনাও এক মহান ইবাদত। তাই পাপ করা মানব স্বভাবের অংশ। মানুষ পাপ না করলে সে সৃষ্টি তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে তারপর তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন'।[১৩] তিনি আরও বলেছেন, 'সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন'।[১৪]

তার মানে এই নয় যে, পাপ করার অনুমতি আছে। সৃষ্টির শুরুতেই মহান স্রষ্টা পাপ-পুণ্য সৃষ্টি করেছেন। পাপ-পুণ্য সম্পাদন করা মানব প্রকৃতির অংশ করেছেন। পুণ্যের পুরস্কারস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন জান্নাত আর পাপের শাস্তিস্বরূপ প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম।[১৫]

বন্ধু আমার! তুমি তো এবার বলতে পার, মহান আল্লাহ তাহলে বারবার পাপ করতে উৎসাহিত করেছেন। অথবা বলতে পার, তিনি পাপের ওপেন লাইসেন্স দিয়েছেন। —না। তুমি বলতে পার না যে আমি পাপ করব অতঃপর ক্ষমা চাইব। —না, এটা করা যাবে না। তুমি পাপে জড়িয়ে পড়তে পার। এটা ঘটবে কিন্তু ইচ্ছা করে নয়। তুমি পাপ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হতে পার না; কিন্তু বাড়ি থেকে বের হয়ে তুমি নানা কারণে পাপে জড়িয়ে যেতে পার। তখন তুমি তওবা করবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।

জেনে রাখো— এই হাদীছের উদ্দেশ্য কখনোই পাপের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা বা উৎসাহ দেওয়া নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর অসীম ক্ষমার ইচ্ছা ও অপার দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করার অভ্যাস গড়ে তোলার তাগিদ দেওয়া। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বান্দার গুনাহ হয়ে গেলে সে যেন অহংকার করে বা লজ্জায় পড়ে কিংবা হীনমন্যতায় ভুগে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত না থাকে; বরং সাথে সাথে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।[১৬]

বন্ধু আমার! একটি উদাহরণ দিলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। মনে কর, তুমি কোনো কোম্পানিতে জব করছ।

---

১১. শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল, কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ মাফের উপায় (মাকতাবাতুশ শাহাদাহ্), পৃ. ২৮।

১২. সুনানে তিরমিযী, হা/২৪৯৯, হাদীছ হাসান; ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫১।

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৫৬।

১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৫৮।

১৫. পাপ, তার শাস্তি ও মুক্তির উপায়, পৃ. ৮-৯।

১৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে গুনাহ মাফের উপায়, পৃ. ২৫।

www.al-itisam.com

তোমার বস তোমাকে একটি খাতা, একটি পেন্সিল ও একটি রাবার দিয়ে বলল, এক ঘণ্টার মধ্যে এই হিসাবটা করে তুমি জমা দাও। হিসাব করতে গিয়ে কোথাও ভুল হলে রাবার ব্যবহার করবে। ধরো, এখন তুমি হিসাব করতে বসেছ। তোমার হাতে পেন্সিল আর রাবার আছে। তাই তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করছ আর রাবার দিয়ে মুছে ফেলছ। এইভাবে তুমি সময় অতিবাহিত করলে। এবার ভাবো তো, এই দৃশ্য যদি তোমার বস দেখে, তাহলে কী তোমায় প্রমোশন দেবে, না-কি তিরস্কৃত করবে?

অনুরূপভাবে, মহান আল্লাহ আমাদের ভুল হলে তা মুছে ফেলার জন্য 'তওবা' নামক রাবার দিয়েছেন। আমাদের জীবনের এই নির্ধারিত সময়ে চলার পথে পাপ হয়ে যেতে পারে। তাই এরকম ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নেওয়াটা আবশ্যক। তবে, তওবার কিছু শর্ত রয়েছে। —হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। তওবার কিছু শর্ত রয়েছে। আমি বারবার পাপ করব আর বলব তওবা করলাম। আমি একদিকে চুরি করব, আর বলব, তওবা-তওবা। এইভাবে কিন্তু তওবা হয় না।

তাহলে কীভাবে তওবা হয়? তওবা কী? আর তওবার শর্তই-বা কী?

বন্ধু আমার! তওবা আরবী শব্দ। এর অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে গেলে তার জন্য আবার আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে। সেই সুযোগের নামই তওবা। সঊদী আরবের বিখ্যাত আলেম 'শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ-এর মতে তওবা হলা, 'আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা থেকে তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসা'।

সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ তওবা হলো কুফর ও শিরক থেকে তওবা করে ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসা। তারপর গুরুত্বপূর্ণ তওবা হলো কাবীরা গুনাহ থেকে তওবা করা। আর সর্বশেষ তওবা হলো ছাগীরা গুনাহ থেকে তওবা করা।[১৭]

বিশুদ্ধ তওবার কিছু শর্ত আছে। আর তা হলো : (১) তওবা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। (২) যে গুনাহ হতে তওবা করা হচ্ছে, তা সত্বর ত্যাগ করতে হবে। (৩) এই গুনাহ করে ফেলার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। (৪) আগামীতে এই গুনাহ আর করব না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (৫) যদি এই গুনাহের সম্পর্ক কোনো বান্দার অধিকারের সাথে হয়, তবে যার অধিকার নষ্ট হয়েছে, তার সাথে মিটমাট করে নিতে হবে। অথবা যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।[১৮]

উপরিউক্ত শর্তগুলো পূরণ করে তওবা করলে মুমিন সকল পাপের ক্ষমার নিশ্চিত আশা করতে পারেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া তওবার একটি প্রকাশ। তবে অন্যান্য শর্তগুলো পূরণ ছাড়া শুধু ইসতিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে পরিপূর্ণ তওবা হয় না। কেউ যদি শর্তগুলো পূরণ না করে বলেন, 'আমি তওবা করছি' তাহলে তা অতিরিক্ত একটি মিথ্যাচার বলে গণ্য হয় এবং পাপের বোঝা বাড়ে। কারণ বান্দা বলছেন যে, আমি আল্লাহর কাছে ফিরে আসছি, অথচ কার্যত তিনি ফিরে আসছেন না। তিনি আল্লাহর নির্দেশমতো বান্দার হক্ব ফিরিয়ে দেননি এবং পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেননি। কাজেই ফিরে আসার বিষয়ে তার ঘোষণাটি মিথ্যা ও পাপ বলে গণ্য।[১৯]

বন্ধু আমার! জেনে রাখো, মানুষের কর্তব্য হলো, সে ভুল করলে সকল প্রকার পাপ থেকে তওবা করবে। যত বারই পাপ করুক না কেন, তত বারই মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবে। তবে ক্ষমা চাইতে হবে তওবার শর্তাবলি পূরণ করে। যদি তওবা করার পর তুমি আবার পাপে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে পুনরায় তওবা করো। বন্ধু! তুমি এখানে শয়তানের পক্ষ থেকে ওয়াসওয়াসা পেতে পার। শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে, এই বলে— 'তুমি তো তওবা রক্ষা করতে পার না' অথবা 'তোমার তওবা বারবার ভেঙে যায়' অথবা 'তোমাকে কি আল্লাহ ক্ষমা করবে' ইত্যাদি; তাই, তুমি তওবা করো না।

কিন্তু জেনে রাখো, এটা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। শয়তান তোমাকে তওবা থেকে বিরত রাখতে চায়। কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত তওবা করা ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(আন-নূর, ২৪/৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো, বিশুদ্ধ তওবা' *(আত-তাহরীম, ৬৬/০৮)*।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১৮. তাফসীর আহসানুল বায়ান (বাংলা অনুবাদ), সূরা আত-তাহরীম, ৬৬/৮ এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

১৯. ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, সপ্তম সংস্করণ), পৃ. ৯৮।

মনীষী পরিচিতি-২ : মাওলানা কাযী আতহার মুবারকপূরী রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : ইসলামের ইতিহাস নিয়ে যারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন ও এ বিষয়ে অসাধারণ লেখনী উপহার দিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে মাওলানা কাযী আতহার মুবারকপূরী রাহিমাহুল্লাহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নাম। ভারতের এই ক্ষণজন্মা আলেমের জীবনী সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপ-

প্রাথমিক পরিচয় : ইসলামিক ঐতিহাসিক মাওলানা কাযী আতহার মুবারকপূরীর বংশীয় নাম হলো 'আব্দুল হাফীয ইবনু শায়েখ হাজী মুহাম্মাদ হাসান'। তিনি ১৩৩৪ হিজরীতে রজব মাসের ৪ তারিখ মোতাবেক ১৯১৬ সনে উত্তরপ্রদেশের আযমগড় জেলার মুবারকপূর গ্রামের হায়দারাবাদ নামক মহল্লায় এমন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে মোঘল বাদশাহ হুমায়ূনের রাজত্বকালে রাজা মুবারকপূর সংলগ্ন জেলা ইলাহাবাদের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ শাহ মুবারক রাহিমাহুল্লাহ কাড়ামাঙ্গ হতে বসবাস ছেড়ে দিয়ে এখানে জনবসতি গড়ে তুলেছিলেন।

মাওলানার বংশে দীর্ঘ সময় যাবৎ বিচারকের পদ দখলে ছিল। এজন্য তাকেও কাযী বলা হয় ও লেখা হয়। ইংরেজদের শাসনামলের শেষ সময়ে বিচারকের পদটি বিশেষ সম্মানজনক ছিল। মুবারকপূরের কাছে মুহাম্মাদাবাদের গোহনায় আদালত ছিল। আর কাযী মুহাম্মাদ সালীম (মৃ. ১২৬৬ হি.) রবীউল আখের মাসের ১২৫০ হিজরী হতে টানা ১৬ বছর যাবৎ মুহাম্মাদাবাদ গোহনার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত ছিলেন। যিনি কাযী আতহার মুবারকপূরীর পরদাদা শায়েখ ইমাম বখশ মুবারকপূরীকে ভারপ্রাপ্ত কাযী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সেখানে ছালাতের জামাআত ক্বায়েম, জুমআ ক্বায়েম ঈদায়েনের ছালাত, সমকালীন মাসআলা-মাসায়েল, বিবাহ-তালাক, জমিবণ্টন, মুসলিমদের মাঝে সংঘটিত ইখতিলাফসহ ইত্যাকার বিষয়াবলির সমাধানমূলক বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

পড়াশোনা : মাওলানা সাহেব বাড়িতে ও মহল্লার একটি ঘরোয়া মক্তবে কুরআনের তৃতীয় পারা অধ্যয়নের সময় মাদরাসা আরাবিয়া ইহইয়াউল উলূম মুবারকপূরে ভর্তি হন। এখানে হাফেয আলী হাসানের কাছে কুরআন খতম করে মুনশী আব্দুল ওয়াহীদ লাহোরপূরীর কাছে উর্দূ, মুনশী আখলাক আহমাদের কাছে গণিত এবং মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ মুবারকপূরীর কাছে ফার্সী ও সুন্দর হস্তলিপির শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৩৫০ হিজরীর সফর মাস হতে ১৩৫৯ হিজরীর শা'বান মাস পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত একই মাদরাসার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইয়াসীনের (মৃ. ২২ই মুহাররম ১৪০৪ হি.) কাছে বেশিরভাগ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। মাওলানা শুকরুল্লাহ মুবারকপূরীর (মৃ. ৫ই রবীউল আউয়াল ১৩৬১ হি.) কাছে মানত্বেক্ব ও দর্শনের আরও গভীর শিক্ষাগ্রহণ করেন। মাওলানা বাশীর আহমাদ মুবারকপূরীর (মৃ. ৩রা শাওয়াল ১৪০৪ হি.) কাছে ইলমে মানত্বেক্বের কিছু গ্রন্থ, মাওলানা মুহাম্মাদ মাযাহিরী হতে তাফসীর জালালাইন এবং আপন মামা মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া রাসূলপূরীর (মৃ. ১১ই সফর ১৩৮৭ হি.) কাছে ইলমে আরূয, কাওয়াফী এবং হায়আতের কিছু পাঠ গ্রহণ করে উর্দূ, ফার্সী এবং আরবী ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠেন। শেষ বছরে দাওরায়ে হাদীছ সমাপ্ত করার জন্য তিনি জামি'আহ কাসিমিয়া মাদরাসায়ে শাহী মুরাদাবাদ গমন করেন এবং সেখানে মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমাদ (মৃ. ১৩৯২ হি.)-এর কাছে ছহীহ বুখারী, সুনানে ইবনু মাজাহ, সুনানে আবূ দাঊদ; মাওলানা সাইয়েদ ইকবাল মিয়াঁ (মৃ. ১৬ই শাউয়াল ১৩৯৫ হি.)-এর কাছে সুনানে তিরমিযী; মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাম্ভুলী (মৃ. ১৩৯৫ হি.)-এর কাছে ছহীহ মুসলিম পড়ে ১৩৬০ হিজরীতে সনদ হাছিল করেন।

মাওলানা ছাত্র থাকাকালেই অধিক পড়াশোনা এবং গ্রন্থে নিমগ্ন থাকার কারণে আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত ও মূলনীতি, যেমন— ভাষা, শব্দের ব্যুৎপত্তি, নাহু, ছরফ, খাছিয়াত ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তার আরবী ভাষায় অত্যাগ্রহ মাকামাতে হারীরী, দিওয়ানে হামাসা, দিওয়ানে মুতানাব্বী, সাবআ মুআল্লাক্বাহ-এর দারস ও লুগাত, সাহিত্যের গ্রন্থাবলি অধ্যয়নের ফল। সূচনাতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যয়নের বরকত এটাই ছিল যে, কাযী সাহেব স্বীয় তা'লীমী যিন্দেগীতে মুশকিল ক্ষেত্রগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে পূর্ণ দক্ষতা হাছিল করেছিলেন। যার কারণে ছাত্রত্বের সময়টুকু অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে অতিবাহিত করতে হয়েছে। এটাই কারণ যে, কাযী সাহেবকে ছাত্র থাকাবস্থাতেই মাদরাসা ইহইয়াউল উলূমের আরবীর ছাত্রদেরকে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পড়ানোর ও বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব মাদরাসার পরিচালনা কমিটির পক্ষ হতে সোপর্দ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক মুবারকপূরীও অত্যন্ত

সাবলীল পদ্ধতিতে ইলমী সফলতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন।

শুরু থেকেই গ্রন্থ সংগ্রহ ও ক্রয় করার শখ ছিল মাওলানা সাহেবের। তিনি বই বাঁধাই করে সেই টাকা দিয়ে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রন্থ ও অধ্যয়নের এই অভিরুচির কারণে তার মাঝে প্রবন্ধ রচনা, কবিতা ও কবির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে মাওলানার প্রথম প্রবন্ধ 'মুসাওয়াত' পত্রিকায় 'মুমিন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বাদাইউনের (ডিসেম্বর ১৯৩৪ খৃ./১৩৫৩ হি.) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় তিনি ছাত্র ছিলেন। এভাবে তার প্রথম কবিতা বেরেলীর 'ফুরকান' পত্রিকায় জুমাদাছ ছানীর সংখ্যায় ১৩৫৭ হিজরীতে 'মুসলিম কী দু'আ' শীর্ষক শিরোনামে ছাপা হয়েছিল।

কর্মজীবন : মাওলানা মুবারকপূরী পড়াশোনা সমাপ্ত করার পর শাওয়াল মাসের ১৩৫৯ হিজরী হতে মুহাররম ১৩৬৪ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে চার বছর যাবৎ স্বীয় ইলমী সূতিকাগার 'ইহইয়াউল উলূম'-এ আরবী শিক্ষক ছিলেন। কিছু বিরতিকাল পর একই মাদরাসায় শাওয়াল ১৩৬৬ হিজরী হতে সফর ১৩৬৭ হিজরী মোতাবেক ১লা অক্টোবর ১৯৪৬ হতে জানুয়ারি ১৯৪৭ পর্যন্ত মোট পাঁচ মাস আরবী ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন।

মাওলানা পড়াশোনার পাঠ চুকানোর পর যথেষ্ট অর্থকষ্টে পড়েন। তিনি অমৃতসর ও লাহোর চলে যান। সেখানে জানুয়ারি ১৯৪৭ সনে 'দৈনিক যমযম'-এর পরিচালক মাওলানা উছমানীর সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পান। তার নির্দেশনায় তিনি সাংবাদিকতায় আসেন। কিন্তু তিনি ১০ জুন ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের কারণে বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে দেশে ফিরে আসেন এবং কখনোই আর যেতে পারেননি। ১৩৬৭ হিজরীর মুহাররম মোতাবেক ১৯৪৭ হতে রজব ১৩৬৭ হিজরী/১৯৪৮ সন পর্যন্ত 'বাহরায়েচ'-এর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আনছার'-এর পরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকেন। যেটি সাত মাস চলার পর উত্তরপ্রদেশ সরকারের রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। শাওয়াল ১৩৬৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৮ হতে শা'বান ১৩৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৯ পর্যন্ত 'জামি'আহ ইসলামিয়া ঢাবীল' মাদরাসায় তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থাকেন। এখানকার একটি শিক্ষাবছর মাওলানা সাহেবের জীবনের ইলমী, কলমী জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল ছিল। 'রিজালুস সিন্দ ওয়াল হিন্দ' গ্রন্থ রচনার সূচনা এখানেই হয়েছিল। যা সিন্ধ ও হিন্দের আলেমদের জীবনী ও অবস্থাসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মনে করা হয়।

জীবিকার সন্ধানে কাযী সাহেব ১৩৬৮ হিজরীর যিলহজ্জ মাস মোতাবেক ১৯৪৯ সনে মুম্বাই চলে যান। আর সেখানে তিনি 'জমঈয়তুল উলামা মুম্বাই জেলা'-এর অফিসে কর্মরত থাকেন। এভাবে আট মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ১৫ই জুন ১৯৫০ 'দৈনিক গণতন্ত্র মুম্বাই'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে মাওলানা এর 'ভারপ্রাপ্ত পরিচালক' হিসেবে নিয়োগ পান। তার মেহনত ও লেগে থাকার কারণে কয়েকদিনের মধ্যেই একে মুম্বাইয়ের একটি গ্রহণযোগ্য দৈনিক পত্রিকা মনে করা হতে লাগল। এমনকি দৈনিক ইনকিলাব মুম্বাইয়ের গ্রহণযোগ্যতা ও অফিসিয়াল দাপটকেও প্রভাবিত করতে লাগল। ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ মুম্বাইয়ের অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পত্রিকা 'ইনকিলাব'-এর সাথে জড়িত হয়ে তিনি ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মাওলানা সাহেবের প্রবন্ধ ও বিরল লিখনের কারণে ইনকিলাবের ব্যাপক উন্নতি হতে লাগল। এ পত্রিকায় মাওলানা সাহেবের দৈনিক তিন/চারটি কলাম প্রকাশিত হতো। কিন্তু সেগুলোতে বর্তমান প্রেক্ষিত ও জ্ঞান হীরকখণ্ডের ন্যায় তথ্যের ভাণ্ডারে ভরপুর থাকত। যা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় মহলে সমাদৃত হতো। ২৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ সন হতে ১৯৯১ সনের এপ্রিল পর্যন্ত ইনকিলাবের মুদ্রিত বর্ণনাসমূহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক লিখন যদি গ্রন্থাকারে ভিন্ন শিরোনামে সংকলন করা হতো, তাহলে একাধিক মৌলিক গ্রন্থে সজ্জিত হতে পারত। আর এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই কলামগুলো সুধী মহলে উৎস ও তথ্যসূত্রের উত্তম উপকরণ হতে পারত। কিন্তু এ কাজ একজন সুযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে।

যখন ১৪ মে ১৯৫৪ সনে সাপ্তাহিক 'আল-বালাগ' মুম্বাইয়ের পদচারণা শুরু হলো, তখন এর সাথে মাসিক 'আল-বালাগ'-এর ভিত্তিও স্থাপিত হয়। অন্য দু'জন পরিচালকের সাথে মাওলানাকেও এ অফিসে শরীক করা হয়েছিল। কিছুদিন পর উভয় পরিচালক এই পত্রিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু মাওলানা মুবারকপূরী প্রায় ২৬ বছর যাবৎ 'আল-বালাগ' পত্রিকার 'মুদীরে তাহরী'র হিসেবে কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন।

আমলী জিন্দেগী : মাওলানার আমলী জিন্দেগী, কলমী ব্যস্ততা, মগ্নতা, অকৃত্রিমতা, নিয়মানুবর্তিতা, তাওয়াক্কুল, মুখাপেক্ষীহীনতা, ঈমান ও ইয়াক্বীন, আত্মনির্ভরতা, দৃঢ় মনোবল, সতর্কতা, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ, অল্পেতুষ্টি, একাগ্রতা, গবেষণা করা, জ্ঞানের গভীরতা, শ্রম ও অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্দীপনা, ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা, নিশ্চিন্ততা, ধারাবাহিকতা, ব্যবস্থাপনা, পরিশীলতা, সভ্যতা, দূরদৃষ্টি, সৌম্য চেহারা ও উত্তম আখলাকে পূর্ণ ছিল। মুম্বাইয়ের মতো শহরে থেকে মাওলানা সাহেব দুনিয়াদারী ও ধনসম্পদ কামানোর খুব বড় সুযোগ পেতে পারতেন। কিন্তু মাওলানার মাঝে যে দুনিয়াবিমুখতা, ইলম অনুসন্ধানের অত্যুগ্র বাসনা ও দ্বীনের প্রতি নির্ভেজাল আবেগ ছিল, তা তাকে সম্পদ কামানোর

সকল রাস্তা হতে বিরত রেখেছিল। সঊদী আরব এবং আরব দেশগুলোর অন্যান্য সুলতান, নেতা, ব্যবসায়ী এবং সুধীমহলে স্বীয় ইলমী প্রভাব ও বাস্তবায়ন থাকার পরও যাবতীয় হাদিয়া-তোহফাকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। যেগুলো দ্বারা তার দুনিয়াবী সম্পদ বৃদ্ধি হতে পারত। মাওলানা স্বীয় দ্বীনী, ইলমী ও কলমী কাজে এতটাই নিমগ্ন ছিলেন যে, যেটুকু খেলে জীবনধারণ সম্ভব কেবল ততটুকুই খেতেন। অন্যান্য সকল সম্পর্ক এবং মনের চাওয়া ও আরাম-আয়েশকে নিজের জীবনে মোটেও গুরুত্ব দেননি।

বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত : মাওলানা কেবল একজন সাহিত্যিক ও কবিই ছিলেন না; তিনি ধর্ম ও রাজনীতির সাথে বাস্তব জীবনেও সম্পর্ক রাখতেন। আর অন্যান্য আন্দোলনসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইলমী ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নির্মাণেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন। ১১ জুমাদাছ ছানী ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৯৫১ মাদরাসা মিফতাহুল উলূম ভূম্ভীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যা অদ্যাবধি উন্নতি বজায় রেখে চলেছে। অনুরূপভাবে মুবারকপূরে রচনা, সংকলনের জন্য তিনি 'দায়েরা মালিয়া' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার জন্য আনছার গার্লস স্কুল মুবারকপূর এবং ১৪০০ হিজরীতে মাদরাসা হিজাযিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন।

ইহইয়াউল উলূম মাদরাসায় কাযী সাহেবের উস্তাদদের মধ্যে কেউই সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, লেখক ও সংকলন ছিলেন না। কিন্তু তিনি স্বীয় যোগ্যতা, আল্লাহ প্রদত্ত দক্ষতার দ্বারা এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে অনুসন্ধানী মন ও অন্তরের টান থাকে; এছাড়াও দৃঢ় উৎসাহের কমতি না থাকে, তাহলে সে ক্ষুদ্র স্থানে থেকেও কল্পনা ও ধারণার স্তর পেরিয়ে আলেমদের কাতারে স্বীয় স্থান করে নিতে পারে। আর সমাজকে স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করাতে পারেন। মাওলানার প্রতিটি ছাত্র ইলমী, তা'লীমী শ্রম, ইতিহাস ও গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ, গভীর উৎসাহ, উচ্চ সাহস, আত্মনির্ভরতার নমুনা ও সৃজনশীলতার ছাপ রাখত।

রচনাসমূহ : প্রায় ৩৫টি গ্রন্থ মাওলানা সাহেব রচনা করেছেন। এ ব্যতীত মাওলানা সাহেবের সফরনামা, পত্রাবলি ও অসংখ্য প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার অপেক্ষায়। ছাত্র থাকাকালীন রচিত 'খায়রুয যাদ ফী শারহি বানাতে সুআদ (আরবী)' গ্রন্থটি অপ্রকাশিত; মিরআতুল ইলম (আরবী) অপ্রকাশিত, আছহাবে ছুফফার নামে কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। 'মে তুহূর' অপ্রকাশিত এবং কবিতার সংকলন বিদ্যমান।

মাওলানার ইলমী ও কলমী খেদমতকে সম্মানের সাথে দেখা হয়েছিল। ভারত সরকার ১৯৮৪ সনে 'সদরে জমহূরিয়াত এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেছে। ১৯৮৪, ১৯৮৬ সনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যিয়াউল হক্ব ইলমী স্বীকারোক্তি হিসেবে অন্যান্য পুরস্কার ও পাকিস্তানের স্মারক চিহ্ন দিয়েছেন। এর সাথে সাথে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহলের পক্ষ থেকে 'মুহসিনে সিন্ধ'-এর উপাধিতেও তাকে ভূষিত করা হয়েছিল।

তামীরাতে আদব মাওলানা আনজুম, লাহোরের নির্ভরযোগ্য, ইদারাতু তুরাছ আল-আরাবী কুয়েতের ইলমী পরামর্শদাতা, জমঈয়তুল উলামা মহারাষ্ট্র-এর সভাপতি, দ্বীনী তা'লীমী বোর্ড মহারাষ্ট্রের সভাপতি, আনজুমান খুদ্দামে নবী মুম্বাইয়ের সদস্য, মুম্বাইয়ের চাঁদ দেখা কমিটির সদস্য, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লাহোরের পারসোনাল ল' বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, শায়খুল হিন্দ দেওবন্দের কর্ণধার, দারুল মুছান্নিফীন আযমগড়ের সম্মানিত উপদেষ্টা, বুরহানে দিল্লীর উপদেষ্টা পরিচালক, দারুল উলূম তাজুল মাসাজিদ ভূপাল, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, জামি'আহ আশরাফিয়া নতুন ভোজপূর (বিহার)-এর মজলিসে শূরার সদস্যও তাকে বানানো হয়েছিল।

মৃত্যু : আল্লাহ তাআলা মাওলানার ইলম, সন্তান, ধনসম্পদে অত্যন্ত বরকত দিয়েছেন। যা গুটিকতক মানুষই পেয়ে থাকে। এটি মাওলানা সাহেবের দ্বীনী ইখলাছ, ইলমী একাগ্রতা, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, আত্মশুদ্ধি এবং দুনিয়াবিমুখতার সুফল। ইলমী দুনিয়ার এই মহান যোদ্ধা ও সম্মানিত ব্যক্তি রবিবার ২৭ সফর ১৪১৭ হিজরী মোতাবেক ১৪ জুলাই ১৯৯৬ সনে রাত ১০টায় দুনিয়ার বন্ধন ছিঁড়ে পরপারে পাড়ি জমান। আল্লাহ তাআলা তাকে রহমত করুন। আমীন!

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মাওলানা কাযী আতহার মুবারকপূরী রহিমাহুল্লাহ একজন ভালো ছাত্র, দক্ষ শিক্ষক, লেখক, গবেষক, বহু ভাষাবিদসহ একাধিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আল্লাহ তার লেখনী দ্বারা মুসলিমজাতির উপকার সাধন ক্বিয়ামত অবধি জারী রাখুন- আমীন!

তথ্যসূত্র :

১. মাওলানা নূর আলম খলীলী আমীনী, পাস-ই মারগ যিন্দা, পৃ. ২৯৯-৩২৯।
২. কাযী আতহার মুবারকপূরী, ক্বায়েদায়ে বোগদাদী সে ছহীহ বুখারী তাক, পৃ. ১৮-১৯।
৩. মাওলানা কামারুযযামান মুবারকপূরী, মাজমূআ কালাম কাযী আতহার মুবারকপূরী, পৃ. ১-৫০।
৪. আল-মুওয়াররিখুল ইসলামী আল-হিন্দী আশ-শাহীর কাযী আতহার মুবারকপূরী ফী যিম্মাতিল্লাহ, পৃ. ৪-১৫।
৫. মাসিক আল-ফয়সাল, সংখ্যা-৪ (২৮ ছফর ১৪২১ হি./জুন ২০০০ খ্রি., রিয়াদ, সঊদী আরব), পৃ. ৯৬-১০০।

প্রভুর ঘোষণা কুরআন সুবোধ্য

-তাজরীন নাহার নুসরাত*

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে হেদায়াতের পথের সন্ধান দিতে পবিত্র কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন। যাতে মানবজাতি কুরআনের বিধিবিধান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং সেখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে জীবনের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি অবধি তার জীবনকে কুরআনের আলোকে ঢেলে সাজাতে পারে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ‘(হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে’ *(ছোয়াদ, ৩৮/২৯)*। আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেছেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ‘আর আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ওই সব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে’ *(আন-নাহল, ১৬/৪৪)*।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের বাণীসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। কুরআনের বাণীসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে। আর কুরআনকে বুঝতে হলে প্রথমেই কুরআন শিখতে হবে। মহান আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন কুরআন শেখা সহজ। মহান আল্লাহর বাণী, ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ ‘বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং কেউ কি আছে যে উপদেশ গ্রহণ করবে?’ *(আল-ক্বামার, ৫৪/১৭)*।

মহান প্রতিপালক তাঁর অফুরন্ত দয়ায় কুরআনকে আমাদের জন্য সুবোধ্য করে দিয়েছেন, যাতে আমরা বুঝতে পারি। কাজেই কুরআনকে বুঝার জন্য, কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদেরকে কুরআন শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। কুরআনকে বেশি বেশি অধ্যয়নের মাধ্যমে কুরআনকে বুঝার দৃঢ় অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু নিজেই বলেছেন যে, তিনি আমাদের জন্য কুরআনকে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। তাই এটা

ভুলেও ভাবা যাবে না যে, কুরআন দুর্বোধ্য। পক্ষান্তরে এমন ভাবা হবে মহান প্রতিপালকের বাণীর ঘোর বিরোধিতা করার শামিল (আল্লাহ আমাদের মাফ করুক)।

কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে অপারগতা দেখানো কোনোক্রমেই যাবে না। কুরআনকে সহজ করা হয়েছে তাই বলে এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হৃদয়ঙ্গম হবে না। এর জন্য মনস্থির করে সময় ব্যয় করতে হবে, অবিরাম পরিশ্রম করে প্রচেষ্টা চালিয়ে কুরআনকে অন্তরে পরিগ্রহ করতে হবে। প্রভুর বাণীকে আয়ত্ত করতে কোনোক্রমেই পরাজয় মানা যাবে না। তবেই কুরআন আমাদের মাঝে তার নূরের তাজাল্লী বিস্তার করবে।

কুরআন শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে কুরআনের উপদেশগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে সেই অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা মূলত কুরআনকে উপদেশ লাভের নিমিত্তেই সুবোধ্য করেছেন। কুরআনে মানবজাতির জন্য আল্লাহ যেসব ম্যাসেজ দিয়েছেন, সেগুলোকে জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে ধারণ করতে হবে। কুরআনের অনুশাসন না মেনে আমরা যদি কুরআনের বাণীসমূহকে আওড়াই, তাহলে এতে আমাদের কোনো উপকার নাই। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, একজন অসুস্থ লোক ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার তাকে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিল। ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে লিখে দিল যে, প্রতিদিন দিনে তিন বার এ ওষুধটি খাবেন। অসুস্থ লোকটা প্রেসক্রিপশনটি নিল এবং প্রতিদিন সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু প্রেসক্রিপশনের নির্দেশনাগুলো কাজে পরিণত করল না, ওষুধগুলো ঠিকমতো খেল না। আপনার কী ধারণা? লোকটা কি সুস্থ হয়ে উঠবে? নিশ্চয়ই সুস্থ ও বিবেকবান কোনো লোক উত্তরটা না-বোধক দিবে। এবার আমাদের কথাই ধরি, এই যে আমরা যতটুকুই কুরআন পড়ছি এবং তা থেকে যা উপলব্ধি করছি, তা যদি বাস্তব জীবনে না মানি, তাহলে কি কোনো লাভ হবে? কখনো হবে না!

* শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী।

কাজেই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি কুরআনের আদেশ-নিষেধগুলোকে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল-কুরআনের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী। যিনি প্রবল পরাক্রমশালী ও সবকিছুর মালিক। তাই আল-কুরআন জ্ঞানের উৎস হিসেবে অনন্য। আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের অমিত জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

আজকের বিশ্বে দেখা যায়, মুসলিমরা কুরআনের মতো এত অনন্য গ্রন্থের অধিকারী হয়েও এই কুরআন থেকে হেদায়াতের নূর আহরণ করতে পারছে না। এটার অন্যতম কারণ হলো কুরআনকে মূল্যায়ন না করা ও সঠিকভাবে তা বুঝতে না পারা। এটা খুবই দুঃখজনক! আল্লাহ তাআলা কত মধুর ভাষায় বলেছেন, ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ‘আমি তোমাদের প্রতি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?’ *(আল আম্বিয়া, ২১/১০)*। সুবহানাল্লাহ! মহান আল্লাহর ভাষা কতটা মধুর, কতটা দরদের, কতটা স্বস্তির! যে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে, সেই একমাত্র তা বুঝতে পারবে।

সর্বোপরি মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন, কুরআন বুঝার জন্য সহজ। তাই কুরআন শেখার ভাবধারা অন্তরে লালন করে কুরআন শিক্ষায় অগ্রগামী হতে এবং তা থেকে উপদেশ লাভ করার জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সফলতা দান করবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝার ও সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

‘হারামাইনের মিম্বার থেকে’-এর বাকী অংশ

কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ওপর দিয়ে ছিরাত বা ব্রিজ স্থাপন করা হবে। কঠিন অন্ধকার মানুষকে ঘিরে ধরবে। এমনকি তারা তাদের হাতের তালুও দেখতে পাবে না। মুমিনদেরকে তাদের আমল অনুপাতে আলো দেওয়া হবে। মুনাফেক্ব নারী-পুরুষরা বলবে, আমাদের জন্য একটু থামো, তোমাদের থেকে আলো নিই। তখন তাদেরকে বলা হবে, পিছনে ফিরে যাও এবং সেখানে গিয়ে নূর তালাশ করো। এই ব্রিজের পাশে কাঁটাযুক্ত তৃণের মতো বড় বড় আঁকড়া থাকবে। শুধু মুমিনগণই এই ছিরাত পার হতে পারবে। প্রথম যাকে এই ছিরাত পার হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ। নবীগণ ছাড়া সেদিন আর কেউ কথা বলবে না। সেদিন নবীগণের কথা হবে, হে আল্লাহ! রক্ষা করো, রক্ষা করো। যখন মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং ছিরাত পার হয়ে জান্নাতের কাছে আসবে, তখন আরেকটি কানতারা বা ছোট ব্রিজে তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে দুনিয়ায় একে অপরের ওপর যুলুমের ক্বিছাছ নেওয়া হবে। যখন তারা একেবারে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। এরপর যখন তারা জান্নাতের কাছে আসবে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম দিবেন।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন, কাফের ও মুশরিকদেরকে লাঞ্ছিত করুন এবং এই দ্বীনকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! আমাদের এই দেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকেও নিরাপদ বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! হারামাইনের এই দেশকে ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র, সীমালঙ্ঘনকারীর শত্রুতা এবং হিংসাকারীর হিংসা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

সাময়িক বন্ধু

-আব্দুর রাযযাক বিন মাসির*

আল্লাহ কত সুন্দর করে এই ধরণি সৃষ্টি করেছেন! ওই নীল আকাশটা কতই না সুন্দর। নীল আকাশের নিচে যখন মেঘমালা ভেসে বেড়ায়, তখন তা দেখতে অপরূপ সুন্দর লাগে। এই মেঘমালার নিচে উড়ে চলেছে পাখির দল। এই দৃশ্যটা দেখতে কাকেই না ভালো লাগে। আল্লাহ এই যমীনটাকে কী সুন্দর করে বিস্তৃত করেছেন। এই যমীনে ছোট ছোট ফুটো করে বসবাস করছে পিপীলিকার দল। এই যমীনের উপর রয়েছে অনেক রকমের গাছগাছালি। এই সবুজ শ্যামল গাছগুলো দেখলেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। যখন এই সবুজের বুক চিরে বয়ে চলে নদনদী, তখন তো কোনো কথাই নেই। এই সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। আর এই নদীতে যখন মাঝি নৌকা চালায়, তখন এই দৃশ্যটা দেখতে যে কতই না সুন্দর লাগে। কিন্তু এখানে একটি ছোট্ট গল্প রয়েছে। এমনই একজন মাঝি একদিন নৌকায় নদীর তীরে বসে ছিল। হঠাৎ একজন লোক দৌড়ে তার ছোট ব্যাগটি নিয়ে উঠে পড়ল নৌকায়। আর বলল, মাঝি ভাইয়া! আমাকে একটু ওপারে রেখে এসো। আমাকে কিছু ছিনতাইকারী মারার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আমাকে একটু সাহায্য করো। মাঝি লোকটির উপর দয়া করল। কিন্তু লোকটি তীরে পৌঁছার একটু আগেই লাফ দিল এবং মাঝিকে বলল, তুমি এই ব্যাগটা রেখে দাও; কাজে লাগবে। সরলমনা মাঝি ব্যাগটা সাদরে গ্রহণ করল। এদিকে লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল। লোকটি যাওয়ার পরই পুলিশ ও একজন ভদ্র লোক আসল। লোকটি মাঝির কাছে ব্যাগটা দেখে বলল, পুলিশ সাহেব! এই তো আমার ব্যাগ। এই মাঝি আমার ব্যাগটা চুরি করেছে। তখন পুলিশ মাঝিকে গ্রেফতার করে নিল। মাঝি পুলিশকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

সুধী পাঠক! অপরিচিত মানুষকে খুব শীঘ্রই বন্ধু বানিয়ে নিবেন না। কারণ বন্ধু দুই প্রকার— (১) প্রকৃত বন্ধু। এই বন্ধু সম্পর্কে আপনারা সকলই জানেন। এই বন্ধু সর্বদা আপনার কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে। (২) সাময়িক

বন্ধু। এই বন্ধু কিছু সময়ের জন্য আপনাকে আপন করে নিবে। এরপর ক্ষতি করতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না। লেখক বায়দাবা কালীলা ওয়া দিমনায় একটি গল্প এনেছেন— রাস্তার পাশে কেউ একজন একটা কূপ খনন করে রেখেছিল। সেই রাস্তা অতিক্রমকালে পর্যায়ক্রমে সাপ, সিংহ, বানর ও একজন স্বর্ণকার সেখানে পড়ে যায়। তারপর একটি লোক সেখান দিয়ে হাঁটার সময় এই চার জনের মধ্যে মানুষটাকে দেখে থেমে গেল এবং ভাবতে লাগল। এতদিন খারাপ কাজ করলাম, আজ লোকটাকে বাঁচিয়ে একটু ভালো কাজ করি। সে লোকটাকে তোলার জন্য কূপে একটি রশি ফেলল। রশি ফেলা মাত্রই বানরটি রশি ধরে উপরে উঠে গেল। আবার রশি ফেলল, এবার সাপটি উঠে এলো। অতঃপর আবার রশি ফেলল, এবার সিংহ উঠে আসল। সিংহ উঠার পর সাপটি বলল, জনাব এই লোকটাকে বাঁচাবেন না। কারণ এই মানুষ কখনো বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবে না। আমি এই এলাকায় থাকি, কখনো সেখানে গেলে অবশ্যই আমাকে স্মরণ করবেন। এই কথা বলে সাপ বিদায় নিল। এবার বানরটি বলল, আমি ওই এলাকায় থাকি। যদি সেখানে যান, তাহলে আমাকে স্মরণ করবেন। এই বলে বানরটিও বিদায় নিল। অতঃপর সিংহও একই কথা বলে বিদায় নিল। লোকটি তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করল না। এবার সে স্বর্ণকারকে তোলার জন্য কূপে রশি ফেলল এবং স্বর্ণকার সেখান থেকে উঠে আসল। অতঃপর তাকে সম্মান দেখিয়ে তাদের অনুরূপ কথা বলে বিদায় নিল। উদ্ধারকারী সেই শহরে কোনো এক প্রয়োজনে গেল। শহরে গিয়ে প্রথমে বানরের সাথে সাক্ষাৎ করল। বানর তাকে সম্মানের সাথে বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। এই বানর বনের ভিতরে গেল। এবার সেখান থেকে তাজা ফলমূল নিয়ে আসল। সে লোকটিকে এই ফল দ্বারা আপ্যায়ন করল। লোকটি তৃপ্তি সহকারে খেল এবং সেখানে থেকে বিদায় নিয়ে সিংহের কাছে গেল। সিংহ তখন বলল, আপনি বসুন, আমি আসছি। এই বলে সিংহ রাজার প্রাসাদে গিয়ে রাজকন্যাকে হত্যা করল। তার গলার হারটা নিয়ে আসল এবং লোকটিকে দিল। লোকটি দ্রুত সেটি নিয়ে বিদায় নিল। সিংহকে জিজ্ঞেসও করল না, হারটা কোথা থেকে নিয়ে আসলে? লোকটি ভাবতে লাগল, এই হারটি স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বেশি মূল্যে বিক্রয় করে দিব। এদিকে রাজা তার রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছে, যে তার মেয়ের খুনিকে ধরিয়ে দিবে, তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। তো এই উদ্ধারকারী যখন স্বর্ণকারের বাড়িতে গেল। তখন স্বর্ণকার তার কাছে হারটা দেখে চিনে ফেলল এবং মহাখুশী হলো। স্বর্ণকার লোকটিকে বলল, ভাই তুমি এখানে একটু বসো, আমার বাড়িতে তেমন কিছু নেই। আমি বাজার থেকে কিছু নিয়ে আসছি। এই বলে স্বর্ণকার রাজার কাছে গিয়ে তার ব্যাপারে বলল। তখন রাজা তার প্রহরী পাঠিয়ে তাকে বন্দি করে ফেলল।

সুধী পাঠক! এই হচ্ছে আমাদের বন্ধুত্ব। যেখানে মানুষকে উত্তম জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, সেখানে এই মানুষ এভাবে বন্ধুত্বের প্রতিদান দিচ্ছে। আমাদের ভাবা উচিত, এ অন্তরটা কখনো এক অবস্থায় স্থির থাকে না। কখনো বন্ধু হয়ে যায় আবার কখনো বাঁচার খাতিরে এই বন্ধুর সাথে শত্রুতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

অতএব, এভাবে মানুষের সাথে সাময়িক বন্ধুত্ব করা থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

* ছাত্র, ৯ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

১৪ ফেব্রুয়ারি

-আশরাফুল হক
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ফেব্রুয়ারির চৌদ্দ তারিখ
গায় ভালোবাসার গান,
এই দিবসে কত মুসলিম
হারায় তাদের সম্মান।
ভালো-মন্দ না বুঝে সব
পড়ে বিধর্মীদের ফাঁদে,
কেউ কেউ সতীত্ব হারিয়ে
নীরবে যে বসে কাঁদে।
কেউ বা আবার উপদেশ দেয়
এর ফাঁদ হতে বাঁচতে,
কেউ চাই পূর্ণ স্বাধীনতা
নগ্ন হয়ে নাচতে।
আমি যে চাই সচেতন হোক
প্রতিটি মায়ের জাত,
নগ্ন ঐ ভালোবাসার মুখে
দেয় যেন তারা লাথ।

ঋণের দায়ে

-মিফতাউল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

হৃদয় মাঝে জমাট বাঁধে কালো মেঘ,
ঋণের দায়ে জড়িয়ে নিজে হলে শেষ।
শখের বসে কিনলে গাড়ি কিস্তি লোনে,
অলস হয়ে কাটালে স্ক্রল করে ফোনে।
পাহাড়সমান বোঝা ঘাড়ের উপর,
কিস্তির খাতায় তবে পড়ল নযর।
ঋণ নিয়ে ঋণ শোধে ভাব তুমি জ্ঞানী,
মাস শেষে ঋণদাতা করে টানাটানি।
কালো মেঘ গাঢ় হলো পড়ে শুধু পানি,
ভিটেমাটি সবই গেল কর রাহাজানি।
লোনের সূদে ঋণের বোঝা হলো বড়,
দিনে দিনে বেড়ে গেল ভারী হলো আরো।
সবকিছু ছেড়েছুড়ে বাড়ি থেকে গেলে,
হতাশ তুমি এখন মৃত্যু বেছে নিলে।

প্রার্থনা

-মাহাতাব হাসান এমরে
আড়পাড়া, শালিখা, মাগুরা।

আকুল প্রাণে সত্য বাণী সদা দিয়ো বলি,
চাহি নাকো যেতে তোমায় আমি ভুলি।
কত শত রিযিক আছে এই দুনিয়ার 'পরে,
আমায় তুমি দিয়ো হালাল রিযিক ঘরে।
শিরক যেন নাহি করি এমন শক্তি দিয়ো,
বাঁচাও মোদের যুলুম থেকে অন্যের হক্ব সব নিয়ো।
শয়তান যেন ভুলায় সবই মুসলিম মোরা ভাই ভাই,
এমন সূত্র হারিয়ে গেছে শয়তান করছে ঠাঁই ঠাঁই।
এমন হৃদয় দাওগো প্রভু ধৈর্য সুখের হাসি,
অন্যের তরে সুখ বিলাব তোমায় করে খুশি।

জ্ঞানী যবে মারা যায়

-মো. জহুরুল
হরিপুর, পোরশা, নওগাঁ।

জ্ঞানী যবে মারা যায় জ্ঞান নিয়ে সাথে
রাসূলের সেই কথা ভাসে মানসপটে।
জ্ঞানীদের মৃত্যুতেই জ্ঞান যাবে উঠে
নির্বোধরা জ্ঞান ছাড়া ধাপড়াবে মাঠে!
প্রতিদিন কত গুণী ছেড়ে যায় ধরা
ওদের মৃত্যুতে মোরা হই দিশেহারা।
আলেমের মৃত্যু দেখে লাগে খুবই শঙ্কা
কবে জানি বেজে উঠে নির্বোধের ডঙ্কা।
মানুষ তো মারা যাবে এ কথাটি সত্য
আলেমের মৃত্যু পরে কাঁদে ভূ অশ্রান্ত।
আলেমের মৃত্যু মানে হারা বড় ধন
এক ধাপ এগিয়ে এ জাতির পতন।

সঠিক পথের সন্ধান

-মুহাম্মাদ সোহাগ মিয়া
আলিম ২য় বর্ষ, ফেকামারা ফাযিল মাদরাসা,
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।

মুক্তির পথ যদি খুঁজে পেতে চাও
সকল পথ ছেড়ে রসূলের পথ খুঁজে নাও।
প্রিয় নবীর পথ যদি খুঁজে পেতে চাও
বক্র পথ ছেড়ে কুরআন-হাদীছ মেনে নাও।
যদি চিরকাল জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাও
মাজারপূজা ছেড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যাও।
পৃথিবীতে নাজাতের পথ যদি খুঁজে পেতে চাও
সকল মত ছেড়ে তাওহীদের পথ খুঁজে নাও।

বাংলাদেশ সংবাদ

মিথেন গ্যাস পাওয়া গেছে বঙ্গোপসাগরে

বঙ্গোপসাগরে মিথেন গ্যাসের (গ্যাস হাইড্রেট) সন্ধান মিলেছে। সমুদ্রে এক গবেষণা সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে। সমীক্ষায় ৩৫০ নটিক্যাল মাইলের ভেতরে মহীসোপানে ৬ হাজার ৫০০ লাইন কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রাঞ্চলে থাকা সম্পদের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকৃত জলসীমায় সমুদ্রে ও তলদেশে গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি পাওয়া গেছে এবং এর অবস্থান, প্রকৃতি ও মজুদের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া গেছে। গ্যাস হাইড্রেট তথা মিথেন গ্যাস মূলত উচ্চচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় গঠিত জমাট বরফ আকৃতির এক ধরনের কঠিন পদার্থ, যা স্তূপীকৃত বালির ছিদ্রের ভেতরে ছড়ানো স্ফটিক আকারে অথবা কাদার তলানিতে ক্ষুদ্র পিণ্ড, শিট বা রেখা আকারে বিদ্যমান থাকে। মহীসোপানের প্রান্তসীমায় ৩০০ মিটারের অধিক গভীরতায় সমুদ্রের তলদেশের নিচে গ্যাস হাইড্রেট পানি ও মাটির চাপে মিথেন বা স্ফটিক রূপে পাওয়া যায়, যা সাধারণত ৫০০ মিটার গভীরতায় স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে। স্থিতিশীল গ্যাস হাইড্রেট সমৃদ্ধ এ অঞ্চলটি সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রায় ১০ থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এর আগে দেশের বিভিন্ন জরিপ থেকে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গ্যাস হাইড্রেটের ভলিউম এবং এই গ্যাস হাইড্রেটটিতে থাকা মিথেনের ভলিউম অনুমান করা হয়েছে। সিসমিক লাইনের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে শুধু বাংলাদেশের ০.১১ থেকে ০.৬৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট সম্ভাব্য প্রাকৃতিক গ্যাস হাইড্রেট জমার **অনুমান পাওয়া গেছে। যা ১৭ থেকে ১০৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের সমতুল্য। দেশের মহীসোপানের সব এলাকার পূর্ণাঙ্গ সিসমিক জরিপ সম্পন্ন করা হলে প্রকৃত মজুদ নিরূপণ করা** সম্ভব হবে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি ও মজুদগুলোর সম্ভাবনা আগামী শতকে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। সমীক্ষায় আরো বলা হয়, ১ সেন্টিমিটার স্ফটিকে আনুমানিক ১৬৪ মিটার মিথেন গ্যাস মজুদ থাকে। মিথেন গ্যাস অন্য জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব। তবে গ্যাস-হাইড্রেট উত্তোলনের প্রযুক্তি সহজলভ্য না হওয়ায় অনেক উন্নত দেশ এখনো গ্যাস হাইড্রেট উত্তোলন শুরু করতে পারেনি।

বছরে ক্যান্সারে লক্ষাধিক মৃত্যু, বেশির ভাগই নারী

বাংলাদেশের মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর একটি হলো ক্যান্সার। এক বছরে দেশে নতুন করে ক্যান্সার রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার ৭৮১ জন। তাদের মধ্যে মারা গেছেন ১ লাখ ৮ হাজার ১৩৭ জন। ক্যান্সার শনাক্ত ও মৃত্যুর হারে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাই বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৫৯.৫ শতাংশই নারী এবং ৪০.৫ শতাংশ পুরুষ। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৭৪.৮ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক এবং ২৫.২ শতাংশ শিশু। আবার পুরুষের তুলনায় নারীরা কম বয়সে ক্যান্সার আক্রান্তের হারও বেশি। বেশিসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ফুসফুসের ক্যান্সার, লিউকেমিয়া, লিম্ফোমায় আক্রান্ত হন। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার, থাইরয়েড ক্যান্সার এবং জরায়ুমুখে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। **অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে অর্ধেকই অর্থাৎ ৪৯.৬ শতাংশ প্রজননতন্ত্রের** ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তবে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে লিউকেমিয়ায় (ব্লাড ক্যান্সার) আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি। গবেষণায় বলা হয়, নারীরা ১৫ বছর বয়স থেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং ৪৬ বছরের মধ্যে বেশি রোগী পাওয়া যাচ্ছে। এদিক থেকে আবার পুরুষের বেশির ভাগই ২০ বছরের পর থেকে আক্রান্ত হচ্ছেন আর ৫০ বছর বয়সের মধ্যেই বেশি রোগী শনাক্ত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে মূত্রথলির ক্যান্সারে আক্রান্ত ১০.২ শতাংশ, প্রটেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত ৯.৯ শতাংশ এবং মুখগহ্বরের ক্যান্সারে আক্রান্ত ৮.৫ শতাংশ। অন্যদিকে নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত ২৩.৩ শতাংশ, জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত ২১.৫ শতাংশ এবং মুখগহ্বর ক্যান্সারে আক্রান্ত ৮.৯ শতাংশ। প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সারে আক্রান্তের হার পুরুষের ১১.২ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে ৩১.৯ শতাংশ। হাসপাতালভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নিয়ে ১৬৫৬ জনের ওপর গবেষণা পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক ১২৩৮ জন এবং শিশু ৪১৮ জন। এখানে পুরুষদের ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্তের হার ৯.৬ শতাংশ, লিউকেমিয়ায় আক্রান্তের হার ৯.৪ শতাংশ, লিম্ফোমায় আক্রান্তের হার ৯ শতাংশ। নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের হার ২৮.১ শতাংশ, থাইরয়েড ক্যান্সারে আক্রান্তের হার ১৬.১ শতাংশ, জরায়ুমুখে ক্যান্সারে আক্রান্তের হার ১২.২ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

১০ বছরে মার্কিন ড্রোন হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ১৩০০ বেসামরিক মানুষ নিহত

পেন্টাগনের গোপন নথি অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় গত এক দশকে ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন। পেন্টাগনের গোপন নথির ভিত্তিতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন বিমান হামলার কয়েকটি ঘটনা তদন্ত করছিল নিউইয়র্ক টাইমস। তা করতে গিয়েই এই বিষয়ে পেন্টাগনের গোপন কিছু নথি সংবাদমাধ্যমটির হাতে আসে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ঘটনাতেও ভুল স্বীকার বা কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। অল্প কিছু ঘটনায় নিহতের স্বজনদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। যদিও গত পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে মার্কিন বাহিনী যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ায় ৫০ হাজারের বেশি হামলা চালিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৬ সালের ১৯ জুলাই সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ড্রোন হামলা চালিয়ে ৮৫ জন ইসলামিক স্টেট (আইএস) যোদ্ধাকে হত্যার দাবি করে মার্কিন বাহিনী। কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমসের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সেই হামলায় প্রাণ গেছে ১২০ জনের বেশি মানুষের। নিহতদের সবাই ছিলেন নিরীহ গ্রামবাসী। একই ঘটনা ঘটেছে ইরাকেও। উল্লেখ্য, ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধরত মার্কিন সেনাদের মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় তুমুল সমালোচনার মুখে পড়তে হয় যুক্তরাষ্ট্রকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে মধ্যপ্রাচ্যে বিমান হামলা ব্যাপকতা পায়। ধীরে ধীরে দেশগুলো থেকে সেনা কমিয়ে ড্রোন হামলা বাড়িয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। বারাক ওবামা এসব বিমান হামলাকে 'ইতিহাসের সবচেয়ে নিখুঁত অভিযান' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলেও এসব হামলা অব্যাহত ছিল।

মুসলিম বিশ্ব

ইসরাঈলী সেনাদের হাতে এক বছরে ৩৬০ ফিলিস্তীনী নিহত

ইসরাঈলী সেনারা ২০২১ সালে অন্তত ৩৬০ জন ফিলিস্তীনীকে হত্যা করেছে। আন্তর্জাতিক নীরবতার সুযোগ নিয়ে ইয়াহূদীবাদীরা এ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। একটি বেসরকারি সংস্থা এ রিপোর্ট দিয়েছে। ইসরাঈলী সেনাদের হাতে নিহত ফিলিস্তীনীদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। স্বজনহারা ফিলিস্তীনী পরিবারগুলোর সংগঠন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব জানিয়েছেন, তারা পুরো ফিলিস্তীনে হত্যাকাণ্ডের সব ঘটনা তদন্ত করেছেন এবং দেখতে পেয়েছেন, ৩৬০ ফিলিস্তীনীর সবাই ইসরাঈলী সেনাদের হাতে নিহত হয়েছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইসরাঈলী সেনাদের হাতে নিহত ফিলিস্তীনীদের ১৯ শতাংশ নারী। ১৯৪৮ সালে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম সবচেয়ে বেশি নারী ইয়াহূদীবাদী সেনাদের হাতে নিহত হলেন। এ ছাড়া নিহত ফিলিস্তীনীদের মধ্যে ২২ শতাংশ হচ্ছে শিশু। আন্তর্জাতিক সমাজ নীরব থাকার কারণে ইয়াহূদীবাদীরা হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ পাচ্ছেন বলে প্রতিবেনটিতে উল্লেখ করা হয়।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

১ ঘণ্টায় পুরো পৃথিবী ঘুরে আসবে বিমান

ঘণ্টায় ১২ হাজার মাইল গতিবিশিষ্ট হাইপারসনিক বিমান তৈরি করছে চীন। এটি বাতাসে উড়বে শব্দের গতির চেয়ে ৫ গুণ বেশি গতিতে। এতে করে ১০ জন আরোহীকে এক ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের যেকোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারবে ওই বিমান। ১৪৮ ফুট বা ৪৫ মিটার লম্বা এই বিমানটি হবে বোয়িং-৭৩৭ এর চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বড়। চীনের কর্মকর্তারা আশা করছেন, ২০৩৫ সালের শেষ নাগাদ এই বিমান আকাশে উড়বে। ২০৪৫ সালের মধ্যে এর ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১০০ যাত্রীতে। তবে কী উদ্দেশ্যে এই বিমান তৈরি করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার কোনো ঘোষণা দেওয়া হয়নি। মঙ্গল গ্রহ এবং চন্দ্র অভিযানের সঙ্গে জড়িত চীনের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় এই বিমানের আদিরূপ প্রকাশ করা হয়েছে। বিমানটি তৈরি করা হচ্ছে বোয়িং মান্তা এক্স-৪৭সি এর ডিজাইনে। এতে ব্যবহার করা হয়েছে দুটি আলাদা ইঞ্জিন। এর সঙ্গে নতুন এক এরোডিনামিক মডেল ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা প্রমাণ করে দেখাতে চেয়েছেন, চীনের সর্বশেষ মহাকাশ মিশন কতটা কার্যকর। পরীক্ষায় তারা দেখতে পেয়েছেন এত গতিতে চলার ফলে বিমানটি অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠবে। ফলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে একে কার্যকর করার চেষ্টা হচ্ছে।

জামি'আহ সংবাদ

সালাফী কনফারেন্স-২০২১

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত দুই দিনব্যাপী **'সালাফী কনফারেন্স-২০২১'** বিভাগীয় শহর রাজশাহীর পবা থানার অন্তর্গত ডাঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ ময়দানে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সে ইসলামপ্রিয় মানুষ দলে দলে উপস্থিত হন। পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে বিমান, বাস, মাইক্রো-বাস, ট্রেন ইত্যাদি যোগে দ্বীনদরদী মুসলিম ভাই-বোনেরা কনফারেন্সে উপস্থিত হন।

১ম দিন বাদ আছর আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী-এর ৭ম শ্রেণির ছাত্র আব্দুল হাসিব-এর কুরআন তেলাওয়াত ও তার সাথীদের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে কনফারেন্সের কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামী সংগীত পরিবেশন করে আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর ছাত্র আদনান বিন দেলোয়ার (৬ষ্ঠ শ্রেণি)। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

সালাফী কনফারেন্সে ১ম দিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ মোস্তফা মাদানী, শায়খ আব্দুল মালেক আহমাদ মাদানী, প্রফেসর মুখতার আহমাদ, ড. মুহাম্মাদ মানযূরে ইলাহী, শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ, ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ড. রফিকুল ইসলাম, শায়খ আব্দুন নূর মাদানী, ড. রেজাউল করিম মাদানী, শায়খ শাহিনুর রহমান (বিশিষ্ট দাঈ, ভারত), শায়খ রফিকুল ইসলাম বিন সাইদ, আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী, রেজওয়ান বিন আলতাফ, আল-ফিরোজ, মুহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ খান প্রমুখ।

সালাফী কনফারেন্স ২০২১-এর ২য় দিন বাদ ফজর আব্দুল বাসেত-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সকালের অধিবেশন শুরু হয়। দারসে কুরআন পেশ করেন শায়খ আব্দুর নূর মাদানী। এরপর সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। এ পর্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক এবং ফৎওয়া প্রদান করেন আব্দুর নূর মাদানী, আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী ও আব্দুল বারী বিন সোলায়মান। তারপর আদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ-এর দাওয়াতী সমাবেশ ও মাসিক আল-ইতিছাম এজেন্ট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল পরিমাণ দাঈ; মাসিক আল-ইতিছামের গ্রাহক ও এজেন্ট অংশগ্রহণ করেন। জুম'আর খুৎবা পেশ ও ইমামতী করেন কনফারেন্স-এর সভাপতি শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

২য় দিন বাদ আছর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কনফারেন্সের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী-এর ১০ম শ্রেণির ছাত্র শাহরিয়ার শুআইব আর ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন আব্দুল্লাহ আল-কাফী। এদিন পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য পেশ করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, শায়খ আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম, শায়খ আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম মাদানী, শায়খ ড. ইমাম হুসাইন, শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, শায়খ সাইদুর রহমান রিয়াদী, ড. আব্দুল বাছীর, শায়খ মুস্তাফীযুর রহমান মাদানী, শায়খ নজরুল ইসলাম সালাফী, শায়খ আব্দুর রহমান সালাফী, শায়খ গোলাম রব্বানী, শায়খ মাহমুদ বিন ক্বাসিম, শায়খ জমসেদ মজুমদার, মুসলেহুদ্দীন বিন সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ রাসেল, শহিদুল্লাহ বিন রহমাতুল্লাহ, আল-আমীন প্রমুখ।

সালাফী কনফারেন্স-২০২১-এ বিভিন্ন পর্যায়ে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শায়খ আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী, ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, আব্দুল বারী বিন সোলায়মান প্রমুখ। এবারের সালাফী কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের জামি'আহ সালাফিয়্যাহ বানারাসের সম্মানিত মুহাদ্দিছ শায়খ ইউসুফ মাদানী হাফিযাহুল্লাহ এবং অনলাইনে লাইভ বক্তব্য পেশ করেন পাকিস্তানের বিখ্যাত মুনাযির ও মুহাদ্দিছ শায়খ গোলাম মোস্তফা যহীর আমানপুরী হাফিযাহুল্লাহ। তারা উভয়েই উর্দূ ভাষায় বক্তব্য পেশ করেছেন এবং তাদের বক্তব্য ভাষান্তর করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। আল-হামদুলিল্লাহ! তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে সালাফী কনফারেন্স আন্তর্জাতিকভাবে এক ধাপ এগিয়ে গেল। মহান আল্লাহ যেন এই পদক্ষেপকে ভবিষ্যতে আরো ফলপ্রসূ করেন- আমীন!

কনফারেন্সের ২য় দিন জামি'আহর শিক্ষার্থীদের একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলা, আরবী ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর ও সাবলীল পরিবেশনা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে চমৎকৃত করে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন তাদের পরিবেশনা। এরপর জামি'আহর হিফয বিভাগ থেকে হিফযসম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের পাগড়ী ও প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়।

সমাপনী ভাষণ : এবারের কনফারেন্সে আগত দ্বীনী ভাইদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তিনি সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। সকলের জন্য প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেন এবং বৈঠক শেষের দু'আ পাঠের মাধ্যমে ৫ম বার্ষিক সালাফী কনফারেন্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বিদা

প্রশ্ন (১) : জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, ফিলিস্তিন হবে ক্বিয়ামতের মাঠ। আর আমি শুনেছি আল্লাহ আরশ নিয়ে অবতরণ করবেন আরাফার মাঠে। আর সেখানেই হবে হিসাব-নিকাশ। এই তথ্য কি ঠিক?

-নাজমুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তর : আরাফার মাঠ ক্বিয়ামতের মাঠ হবে একথা ঠিক নয়। ক্বিয়ামতের মাঠ হবে শাম দেশ। তবে এই শাম (সিরিয়া) দেশে মানুষ দুইবার একত্রিত হবে। একবার শেষ যামানায় দুনিয়াতে আরেকবার পরকালে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অচিরেই হাযরামাউতের দিক থেকে বা হাযরামাউত থেকে একটি আগুন বের হবে যা পৃথিবীর সকল মানুষকে একত্রি করবে। আমরা বললাম, আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনি আমাদের কী আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা তখন শামে চলে যাবে' (তিরমিযী, হা/২২১৭; মিশকাত, হা/৬২৬৫)। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الشَّامُ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ 'শামদেশ হবে হাশর-নাশরের মাঠ' (মুসনাদে বাযযার, হা/৩৯৬৫; ছহীহুল জামে', হা/৩৭২৬)।

প্রশ্ন (২) : দ্বীনের ভিতরে 'মধ্যমপন্থা' বলতে কী বুঝায়?

-শাহিনুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তর : 'মধ্যমপন্থা' বলতে 'হক্বের কিছু ছাড় দিয়ে বাতিলের কিছু মেনে নিয়ে সমন্বয় করে চলা' সমাজে প্রচলিত এই অর্থ নিছক ধোঁকা ও সুকৌশলে মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করার চক্রান্ত। "মধ্যমপন্থা" কুরআন ও হাদীছে যা বুঝানো হয়েছে তা নিম্নরূপ: মহান আল্লাহ কুরআনে উম্মতে মুহাম্মাদীকে মধ্যম জাতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, অনুরূপ আমি তোমাদের মধ্যমপন্থী জাতি করেছি যাতে তোমরা সাক্ষী হও মানুষের বিরুদ্ধে এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী হোন তোমাদের পক্ষে (আল-বাক্বারা, ২/১৪৩)। মধ্যমপন্থার বেশ কিছু অর্থ রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা হল। ১. ইনছাফ-মধ্যমপন্থার যে সকল অর্থের সাথে এই জাতি বিশেষিত তার একটি হলো ইনছাফ যা একজন সাক্ষীর মধ্যে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য থাকা জরুরী। আর যার ভিতরে ইনছাফ থাকবে না তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং ন্যায়পরায়নতা সাক্ষদাতা ও অন্বেষনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানুষ সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক পন্থায় রিযিক্ব অন্বেষণ করো। কেননা কোনো আত্মা তার রিযিক্ব পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না যদিও তা ধীর বা স্বল্প গতিতে আসে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করে সঠিক পন্থায় রিযিক্ব অন্বেষণ করো। যা হালাল তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হারাম তা বর্জন কর (ইবনু মাজাহ, হা/২২৪৪)।

প্রশ্ন (৩) : ছোঁয়াচে রোগ বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

-আব্দুল্লাহিল কাফী
মালোশিয়া।

উত্তর : কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা ছোঁয়াচে রোগ প্রমাণিত নয়। এমর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (১) আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সংক্রামক ব্যধি ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়। লোকেরা বলল, শুভ লক্ষণ কী? তিনি বললেন, উত্তম বাক্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৭৬)। (২) আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, 'এক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উটের পাল অনেক সময় মরুভূমির চারণ ভূমিতে থাকে, মনে হয় যেন নাদুস-নুদুস জঙ্গলী হরিণ। অতঃপর সেখানে কোনো একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট এসে আমার সুস্থ উটগুলোর সাথে থেকে এদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। তিনি বললেন, তাহলে প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে? (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭১৭)। (৩) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রোগের কোনো সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের লক্ষণ নয়, সফর মাসেও কোনো অশুভ নেই। কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তুমি বাঘ থেকে দূরে থাক' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭০৭)। (৪) আমর ইবনু শারীদ তার পিতার বরাদ দিয়ে বলেন, 'ছাক্বীফ গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে একজন কুষ্ঠরোগী ছিলেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে (সংবাদ) পাঠালেন যে, আমরা তোমাকে বায়'আত করে নিয়েছি। তুমি ফিরে যাও' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩১)। (৫) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রোগাক্রান্ত উটকে সুস্থ উটের সাথে রেখো না। অবশ্য সুস্থ উটকে যেখানে ইচ্ছা রাখতে পার। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এমনটি কেন করা হবে? তিনি বললেন, কারণ তা ক্ষতিকর' (মুয়াত্ত্বা মালেক, ৫/১৩৮১)।

উল্লেখ্য যে, যে সকল হাদীছের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, সংক্রমণ রোগ আছে। মূলত তা সংক্রমণ রোগ নয়। বরং ইসলামের সঠিক বিশ্বাস হচ্ছে- কোনো রোগ নিজস্ব ক্ষমতায়

অপরের মাঝে সংক্রমণ হতে পারে না। বরং তাক্বদীরে থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা অপরের মাঝে সংক্রমণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগ সংক্রমণ হয় না বরং আল্লাহ চাইলে তা অপরের মাঝে ছড়ায়।

শিরক

প্রশ্ন (৪) : কেউ যদি আমাকে শিরকের দিকে ডাকে অথচ সে জানে না যে, তা শিরক। সে ক্ষেত্রে আমি সেখানে না যাওয়ার জন্য কি মিথ্যা বলতে পারব?

-জুলকার

ঢাকা।

উত্তর : এমন অবস্থাতে প্রথমত যে কাজটি করতে হবে তা হলো- তাকে শিরকের ভয়াবহতা সর্ম্পকে জানাতে হবে যাতে সে শিরক সর্ম্পকে ভালোভাবে অবগত হতে পারে এবং বিরত থাকতে পারে। এরপর তাকে এমন সব জায়গাতে গেলে তার শিরক হয়ে যাবে সে বিষয়টিও উল্লেখ করতে হবে। তবে মিথ্যা কথা বলা হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কারণ যেসব জায়গাতে মিথ্যা বলা বৈধ রয়েছে উক্ত বিষয়টি তার অন্তর্ভূক্ত নয়। উম্মে কুলসূম রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মানুষকে তিনটি বিষয়ে মিথ্যা কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন তা শ্রবণ করেছি। আর তা হলো- (১) যুদ্ধের ক্ষেত্রে (২) মানুষের মাঝে মীমাংসার ক্ষেত্রে (৩) এবং স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তার মাঝে (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৫; মিশকাত, হা/৫০৩১)।

প্রশ্ন (৫) : শুনেছি তা'বীয ব্যবহার করা শিরক। এখন কোনো ব্যক্তি যদি তা'বীয দেয় তাহলে সে ঈমানদার থাকবে না-কি মুশরিক হয়ে যাবে?

-মিল্লাত

হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

উত্তর : তা'বীয ব্যবহার করা শিরক। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তা'বীয লটকাল সে শিরক করল' (মুসনাদে আহামাদ, হা/১৭৪৫৮)। আর যে ব্যক্তি তা'বীযের ব্যবসা করে বা তা'বীয দেয় এমন ব্যক্তিকে শিরককারী বলা যেতে পারে। কেননা অনেক মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করার পরেও শিরককারী হয়ে থাকে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে' (ইউসুফ, ১০৬)। সাথে সাথে তা'বীয দেওয়া অন্যায় কর্মে সহযোগিতার শামিল। আর অন্যায় কর্মে সহযোগিতা করা হারাম। 'তোমরা ভালো এবং তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

শিরক- ছবি-মূর্তি

প্রশ্ন (৬) : আমি যতটুকু জানি ছবি তোলা ভিডিও করা জায়েয নয়। কিন্তু বর্তমানে আলেম সমাজ যেভাবে ছবি তোলে আর ভিডিও করে তা কতটুকু শরীয়াতসম্মত। কুরআন হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-নূর উদ্দিন

নোয়াখালী।

উত্তর : ছবি তোলা শরীয়তে স্বাভাবিকভাবে হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ 'তথা প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (ছহীহ মুসলিম, ২১১০; মিশকাত, হা/৪৪৯৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৮১১)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি প্রদান করা হবে সেই ব্যক্তিকে যে ছবি অঙ্কন করত' (ছহীহ বুখারী, হা/৬১০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮)। তবে যে ছবি তাৎক্ষনিকভাবে তোলা হয় ও বের করা হয় তা উক্ত হাদীছের অন্তর্ভূক্ত হবে না। আর এ ক্ষেত্রে দুইটি অবস্থা রয়েছে- (১) যদি তা কোনো বৈধ কাজের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা জায়েয হবে (২) আর যদি তা অবৈধ কাজের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা বৈধ হবে না (মাজমূউল ফতওয়া লি ইবনে উছাইমীন, ১২/৩৩০)। অনুরূপভাবে মানুষ যদি কোনো কাজের ক্ষেত্রে বাধ্য হয় এবং তা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই সে ক্ষেত্রেও বৈধ হবে। যেমন: ইলমি বৈঠকে অংশ গ্রহণ, গাড়ির ড্রাইভিংয়ের জন্য, কোনো কিছু সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। অবশ্য সকল প্রকারের অপ্রয়োজনীয় ছবি তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইবাদত- পবিত্রতা-ওযূ

প্রশ্ন (৭) : মহিলাদের মাথার চুল খোপা বাঁধা অবস্থায় কি ওযূতে মাথা মাসাহ করতে পারবে, না-কি চুল ছেড়ে দিয়ে মাথা মাসাহ করতে হবে?

-আবুল কাশেম

জামালপুর।

উত্তর : নারী পুরুষ সকলের জন্য পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরয। কেননা ওযূর ফরযসমূহের মধ্য হতে একটি ফরয হলো- পূর্ণ মাথা মাসাহ করা। মহান আল্লাহ বলেন, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 'তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো' (আল-মায়েদা, ৬)। আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন। উভয় হাতকে সামনে ও পিছনে নিয়েছেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে হাত দুটি মাথার পিছন দিকে নিয়ে গেছেন। এরপর হাত দুটি আবার যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সে স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। তারপর তাঁর দুই পা ধৌত করেছেন (তিরমিযী, হা/৩২; ছহীহ বুখারী, ১৮৫; মিশকাত, হা/৩৯৩)। মহিলাদের ওযূর জন্য মাথার চুল খোলা জরুরী নয়। বরং চুল যেভাবে আছে সেভাবে রেখেই পূর্ণ মাথা

মাসাহ করা যথেষ্ট। রুবাই' বিনতু মু'আব্বিয ইবনু 'আফরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা তাঁর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূ করলেন। তিনি (ওযূতে) চুলের উপরিভাগ থেকে শুরু করে প্রত্যেক পাশে নিচের দিকে চুলের ভাজ অনুযায়ী এবং চুলকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে পুরো মাথা মাসাহ করলেন (আবূ দাউদ, হা/১২৮)।

ইবাদত- ছালাত

প্রশ্ন (৮) : ইমামের আগে রুকূ', সিজদা, ক্বিয়াম ইত্যাদি করার বিধান কী? অনেক মানুষকে দেখা যায় ইমাম সালাম ফেরানোর অনেকক্ষণ পর সালাম ফেরায়। আসলে ইমামের পিছনে সালাম ফেরানোর সঠিক সময়টি কখন?

-আব্দুল্লাহ
ঢাকা।

উত্তর : ইমামের আগে রুকূ, সিজদা, ক্বিয়াম ইত্যাদি করা হারাম। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হে মানুষ সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমাম। বিধায় তোমরা রুকূ', সিজদা, ক্বিয়াম, বসা এবং সালাম আমার পূর্বে করো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪২৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৩২৩)। বরং এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কঠোরতা আরোপ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে তার মাথা ইমামের পূর্বেই উত্তোলন করে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথাতে অথবা গাধার আকৃতিতে পরিনত করে দিবেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪২৭; আবূ দাঊদ, হা/৬২৩)। ইমামের পিছনে সালাম ফিরানোর সঠিক সময় হলো- ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই সালাম ফিরানো। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় কেবল তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করার জন্য। অতএব ইমাম যখন তাকবীর দিবে তখন তোমরা তাকবীর দাও এবং যখন ইমাম রুকূ' করে তখন তোমরা রুকূ' কর...' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১৭)। উক্ত হাদীছে বুঝা যায় যে, সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে বেশি দেরি করা যাবে না। বরং ইমামের সালাম ফিরানোর পরপরই ফিরাতে হবে।

প্রশ্ন (৯) : ছালাতে দাঁড়ানোর পর কি চোখ বন্ধ করা যাবে, না-কি চোখ সিজদার স্থানে খোলা রাখতে হবে? চোখ বন্ধ থাকলে কি কোনো সমস্যা হবে?

-হৃদয় আহমেদ
ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের মধ্যে চক্ষু খুলে রাখা বিধিবদ্ধ সুন্নাত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা গৃহে প্রবেশ করার পর সেখান থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর দৃষ্টি সিজদার স্থান হতে সরাননি (মুসতাদরাক হাকেম, হা/১৭৬১; সুনানুছ-ছুগরা, হা/১৩৬৭)। ক্বিলাবা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুসলিম ইবনু ইয়াসারকে জিজ্ঞাসা করলাম। ছালাতে মুছল্লির দৃষ্টি কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, তোমার সিজদার, স্থানে (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৬৫৬২)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, একবার নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি নকশা করা চাদর পরে ছালাত আদায় করলেন। ছালাতের পরে তিনি বললেন, 'এ চাদরের কারুকার্য আমার মনকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। এটি আবূ জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে একটি 'আম্বিজানিয়্যা' (নকশাহীন চাদর) নিয়ে এসো (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫২)। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর একটি পর্দা ছিল, যা দ্বারা তিনি ঘরের একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমার এ পর্দা সরিয়ে ফেল। কারণ তার ছবিসমূহ আমার ছালাতের মাঝে আমার চোখে পড়ে'। (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৪; মিশকাত, হা/৭৫৮)। যদি ছালাতে চক্ষু বন্ধ করে রাখা শরীয়তসম্মত হত, তাহলে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই চক্ষু বন্ধ রাখতেন এবং সেই চিত্রগুলো তাকে অমনোযোগী করত না। (ফতওয়া লাজনা দায়েমা, ৫/৩৭৯ পৃ.)। অনেকে বলে থাকেন, ছালাতে খুশূ'-খুযূ সৃষ্টির জন্য চক্ষু বন্ধ করা যায়। তাদের এই বক্তব্যের পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১০) : ছালাতে যে অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয, তার মাঝে যদি সামান্য ছিদ্র থাকে, তাহলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-সদরুদ্দীন
ঢাকা।

উত্তর : নারী-পুরুষ সকলের জন্য ছালাতে সতর ঢেকে রাখা শর্ত এবং আবশ্যক (আল-মুগনী, ১/৩৩৭)। কেননা সতর খোলা অবস্থায় ছালাত কবুল হয় না। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ 'কোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না ছাড়া ছালাত আদায় করলে, আল্লাহ তার ছালাত কবুল করবেন না' (ইবনু মাজাহ, হা/৬৫৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৮৭৬)। সুতরাং স্বেচ্ছায় কোনো ব্যক্তি সতর খোলা রেখে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত বাতিল হবে। তাই এই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং সতর বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন পোষাক পরিধান করা হতে বিরত থাকতে হবে। আর অজ্ঞতা বা ভুলক্রমে যদি সতরের কোনো অঙ্গ ছালাতে খুলে যায় তাহলে তার ছালাত হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বান্দার অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন (ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৫; মিশকাত, হা/৬২৮৪)। আর ছিদ্র যদি অতি সামান্য হয়ে থাকে যার কারণে সতর দেখা যায় না বা মানুষের নজরে পড়ে না, তাহলে এমন ছিদ্রের কারণে ছালাতের কোনো সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন (১১) : ছালাতে সালাম ফিরার সময় কি দুই কাঁধের উপর দৃষ্টি দিতে হবে?

-মোশাররফ হোসাইন
ধানখোলা, মেহেরপুর।

উত্তর : সালাম ফিরানোর সময় কোথায় দৃষ্টি রাখতে হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। তবে ডানদিকে কিংবা বামদিকে তাকানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। জাবের ইবনু সামুরা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '...যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরাবে, তখন তার পাশেরজনের দিকে তাকাবে, হাত দিয়ে ইশারা করবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩১)। নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডানদিকে সালাম ফিরানোর সময় বলতেন আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। এমনকি তার ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত। আবার বামদিকে সালাম ফিরানোর সময় বলতেন আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। এমনকি তার বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেত' (নাসাঈ, হা/১৩২৫; মিশকাত, হা/৯৫০)। ইবনু রাসলান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছে 'অধিক পরিমাণে ঘুরে তাকানোর প্রমাণ পাওয়া যায়' (শারহু সুনান আবী দাঊদ লি ইবনি রাসলান, ৫/২৯০)। ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ডানদিকে কেউ থাকলে যেমন তার দিকে তাকিয়ে সালাম দেয়, সেভাবে ডানদিকে দৃষ্টি ফিরাবে' (আওনুল মা'বূদ, ৩/২০২)। তাই সালাম ফিরানোর সময় ডানে-বামে তাকিয়ে সালাম ফিরালেই হবে। কাঁধ কিংবা পাশের জনের দিকে তাকানো জরুরী নয়।

প্রশ্ন (১২) : ছালাতের পর কেউ যদি বুঝতে পারে যে, অসাবধানতাবশত কাপড় টাখনুর নিচে ছিল, তাহলে কি ছালাত আবার পড়তে হবে?

-শামীম
উত্তরা, সেক্টর-১০, ঢাকা।

উত্তর : টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা কাবীরা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'লুঙ্গির যে পরিমাণটুকু পায়ের গাঁটের নিচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৮৭; মিশকাত, হা/৪৩১৪)। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না; তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তাদের জন্য ধ্বংস! তারা কারা? তিনি বললেন, যে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে, যে অনুগ্রহ বা উপকার করে খোঁটা দেয় এবং যে মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের মাল চালু (বিক্রয়) করার চেষ্টা করে (ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬; মিশকাত, হা/২৭৯৫)। তবে অজ্ঞতাবশত কিংবা অসর্তকতাবশত যদি এমন হয়ে যায় তাহলে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা এমন অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃত এবং যার উপর তাকে বাধ্য করা হয়, তার পাপকে ক্ষমা করেন' (ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৫; মিশকাত, হা/৬২৮৪)।

প্রশ্ন (১৩) : দু'আ কুনূত ছাড়া শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে এক রাকা'আত বিতর ছালাত পড়া যাবে কি?

-আদনান
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : শুধু সূরা ফাতেহা নয় বরং ছালাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়া সুন্নাত। এক রাকা'আত বিতর পড়াই উত্তম। বিতর ছালাতে মাঝে মাঝে দু'আ কুনূত পড়া সুন্নাহ আর মাঝে মাঝে ছেড়ে দেওয়া জরুরী। কেননা বিতর ছালাতে নিয়মিত কুনূত পড়া বিদ'আত। তাই বিতর ছালাতে দু'আ কুনূত না পড়লেও বিতর ছালাত হয়ে যাবে। হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতর ছালাতে পড়ার জন্য আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়েছেন অর্থাৎ দু'আয়ে কুনূত শিখিয়েছিলেন... (আবূ দাঊদ, হা/১৪৪৫; তিরমিযী, হা/৪৬৪; নাসাঈ, হা/১৭৪৫; মিশকাত, হা/১২৭৩)। আবূ মালেক আল আশজা'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে পিতা! আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বকর, 'উমার, 'উসমান, আর 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-এর পেছনে কুফায় প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত ছালাত আদায় করেছেন। এসব মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ কি 'দু'আ কুনূত' পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন, হে আমার পুত্র! দু'আ কুনূত (নিয়মিত) পড়া বিদ'আত (তিরমিযী, হা/৪০২; মিশকাত, হা/১২৯২)।

প্রশ্ন (১৪) : ছালাতের রুকন এবং ওয়াজিবসমূহ কী কী?

-মিনহায পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্টভাবে ছালাতের রুকন ও ওয়াজিব আলাদাভাবে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং পৃথকভাবে রুকন ও ওয়াজিব বলা যায় না। তবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাতের কিছু আমলকে ফরয বলা যায়। ১. দাঁড়ানো- সক্ষম ব্যক্তির দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা (আল-বাক্বারা, ২/২৩৮)। ২. তাকবীরে তাহরীমা- তাকবীরে তাহরীমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত

www.al-itisam.com

উঠানো। মহান বলেন, ‘তোমার প্রভুর জন্য তাকবীর দাও’ (আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৩)। ৩ ও ৪. রুকূ ও সিজদা করা (হজ্জ, ২২/৭৭)। ৫. ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, ৬. সিজদা থেকে মাথা উঠানো, ৭. দুই সিজদার মাঝে বসা, ৮. ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা তথা প্রত্যেক রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭; মিশকাত, হা/৭৯০)। ইত্যাদি...

প্রশ্ন (১৫) : প্রত্যেক ছালাতের পর ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়তে হয়। এই আমল কি সুন্নাত বা নফল ছালাতের পর করা যাবে?

-মোসা. মানসুরা খাতুন
সাহাপাড়া, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : করা যায়। কেননা ছালাতের পরবর্তী তাসবীহ-তাহলীলগুলো ফরয ছালাতের পর পাঠ করার ব্যাপারে যেমন বর্ণনা পাওয়া যায় তদ্রূপ ব্যাপকতার হাদীছও পাওয়া যায়। যেখানে তিনি ফরয, সুন্নাত, নফলকে আলাদাভাবে বিভক্ত করেননি (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৩০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৭১; মিশকাত, হা/৯৭৩, ৯৪৯)। অতএব কেউ চাইলে সুন্নাত ছালাতের পরেও তা পড়তে পারে। আল্লাহ ভালো জানেন।

প্রশ্ন (১৬) : মাগরিবের আযানের আগ মুহূর্তে মসজিদে ঢুকে কি তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছালাত আদায় করা যাবে?

-ফয়েজউল্লাহ
মিরপুর-১২।

উত্তর : ছালাত দুই ধরণের। ১. ছালাতে আছলী বা মৌলিক ছালাত ২. ছালাতে সাবাবী বা কারণভিত্তিক ছালাত। মৌলিক ছালাত বলতে বুঝায় ফরয ছালাত, ফরয ছালাতের আগের-পরের সুন্নাত ছালাত, তাহাজ্জুদের ছালাত ইত্যাদি। আর কারণভিত্তিক ছালাত হলো যা কোনো কারণের প্রেক্ষিতে আদায় করা হয়। যেমন : তাহিয়্যাতুল ওযূ; ওযূ করলে পড়তে হয়। তাহিয়্যাতুল মসজিদ; মসজিদে প্রবেশ করলে পড়তে হয়। মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকা’আত ছালাত; তওয়াফ করলে পড়তে হয় ইত্যাদি। যে সকল সময়ে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ, তা মূলত ছালাতে আছলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর ছালাতে সাবাবীর কোনো সময়সীমা নেই। যখনই সাবাব তথা কারণ ঘটবে, তখনই সেই ছালাত আদায় করতে হবে। এজন্য রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন দুই রাকা’আত ছালাত না পড়ে যেন না বসে’ (ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪)। তাই সূর্যাস্তের সময়েও মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকা’আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে।

ইবাদত- জানাযা

প্রশ্ন (১৭) : জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মেলানোর দলিল জানতে চাই?

-জিনান বিন মইনুদ্দীন
গোয়ালডিহি খানসামা দিনাজপুর।

উত্তর : জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করা দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। ত্বালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আওফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ তাতে তিনি সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করলেন। তিনি ক্বিরা’আত জোরে পড়ে আমাদের শুনালেন। তিনি যখন ছালাত শেষ করলেন তখন আমি তাকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা সুন্নাত এবং হক্ব (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩৫; নাসাঈ, হা/১৯৮৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩০৭১)।

ইবাদত- হজ্জ-উমরা

প্রশ্ন (১৮) : একই সফরে কতবার ওমরা পালন করা যায়?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : একই সফরে একবার উমরা পালন করাই শরীয়তসম্মত এবং তা সালাফগণ কর্তৃক প্রমাণিত। তবে যারা বলে থাকেন যে, মক্কা থেকে তানঈম নামক জায়গায় গিয়ে পুনরায় উমরা পালন করা যাবে। তা সঠিক নয়। কারণ তা ছিল আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর জন্য খাস এবং তখন তিনি হায়েয অবস্থায় ছিলেন (যাদুল মা’আদ, ২/৮৯-৯০)। তবে এ ক্ষেত্রে আলবানী রাহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর জন্য নির্দিষ্টভাবে খাস না করে যেসব মহিলা হায়েযগ্রস্থ হবে তাদের জন্য খাস করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটা একটি বিদ’আত যার ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীরা কেউই উৎসাহ প্রদান করেননি এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করার সময় সেখানে ১৯ দিন থাকা সত্ত্বেও পুনরায় তানঈমে গিয়ে উমরা পালন করেননি। বিধায় একই সফরে একাধিক উমরা পালন করা বিদ’আত হবে (লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ, ২৮/১২১)।

ইবাদত- যাকাত

প্রশ্ন (১৯) : যাকাত যাকে দেওয়া হবে তাকে কী জানানো জরুরী যে এটা যাকাত হতে তাকে দেওয়া হচ্ছে? না জানিয়ে দেওয়ার বিধান আছে কী?

-ফারুকুর রহমান
সিরাজগঞ্জ সদর।

উত্তর : (ক) যাকাতের অর্থ জানিয়ে দেওয়া ভালো। কেননা অনেকে যাকাতের হক্বদার হওয়া সত্ত্বেও আত্মমর্যাদার কারণে

যাকাত গ্রহণ করতে চায় না। বরং পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে ভালোবাসে। আবার সবার জন্য যাকাত গ্রহণ করা জায়েযও নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍّ ‘ধনী ব্যক্তি ও সুঠাম দেহের অধিকারী কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ (বা তাদের যাকাত প্রদান) বৈধ নয় (আবূ দাঊদ, হা/১৬৩৪)। আত্বা ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, পাঁচ শ্রেণির লোক ব্যতীত ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয় ১. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী ২. যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী ৩. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ৪. কোন ধনী ব্যক্তির গরীবের প্রাপ্ত যাকাত স্বীয় অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা ৫. যার মিসকীন প্রতিবেশী নিজের প্রাপ্ত যাকাত তাকে উপঢৌকন হিসাবে দান করলে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ বৈধ (আবূ দাঊদ, হা/১৬৩৫)। তবে যদি নিশ্চিত জানা থাকে যে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র এবং তাকে অবগত করলে অভাবগ্রস্ত হলেও যাকাত গ্রহণ করবে না। তাহলে তাকে না জানিয়েও যাকাত দেওয়া যায় (আল-মুগনী ‘ইবনু কুদামা, ২/৫০৮ পৃ.)।

ইবাদত- মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন (২০) : জায়গা স্বল্পতার কারণে আমাদের এখানে একটি মসজিদ স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো- আগের মসজিদের জমি বিক্রি করে বর্তমান নবনির্মিত মসজিদে সেই টাকা লাগানো যাবে কি? মসজিদের জমি ক্রয় করে সেখানে ঘর-বাড়ি বা অন্য কোনো বৈধ স্থাপনা তৈরি করা যাবে কি?

-মো. নাহিদ আলী
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : জায়গা সংকুলান না হওয়ার ফলে অন্যত্র সুবিধা মতো মসজিদ স্থানান্তর করা যায় এবং আগের মসজিদের জমি বিক্রি করে তার মূল্য পরবর্তী মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যয় করাতে এবং সে স্থানে যেকোনো বৈধ স্থাপনা তৈরিতে শারঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)। একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল চুরি হলে সে ঘটনা উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (ফতওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩১/২১৭ পৃ.)। একদা ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লা-হ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি মসজিদে স্থান সংকুলান না হয় এবং স্থানটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তার চাইতে প্রশস্ত স্থানে মসজিদ স্থানান্তর করা হয়, অথবা মসজিদটি জীর্ণ ও বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে অন্যত্র নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তা ব্যয় করতে হবে, যা আগের চাইতে অধিক কল্যাণকর হয়। এক্ষেত্রে ‘মাছলাহাত’-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে, ‘প্রয়োজন’-কে নয়, যা অনেক সময় নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে। অতএব বাধ্য না হলেও অধিকতর কল্যাণ বিবেচনায় মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে। যেমন সংকীর্ণ ও ঘিঞ্জি এলাকা থেকে মসজিদ সরিয়ে খোলা ও প্রশস্ত এবং রাস্তা সংলগ্ন স্থানে পুনঃস্থাপন করা। সেক্ষেত্রে পুরানো মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে নতুন মসজিদে লাগাবে। কারণ এর মধ্যেই ওয়াকফকারীর জন্য অধিক নেকী রয়েছে। এমতাবস্থায় বিক্রিত জমিতে যেকোনো বৈধ স্থাপনা করা যাবে (ফতওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ৩১/২১৬, ২২৪, ২২৭, ২৩৩ পৃ.)।

ইবাদত- যিকির-আযকার

প্রশ্ন (২১) : ফজরের পর কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে সূর্য উঠার সময় বিরত থাকব, না-কি পড়ে যাব?

-নিয়ামুল হাসান
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : তিন সময় ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ- ১. সূর্য উদিত হওয়ার সময়, ২. সূর্য ডোবার সময় ৩. সূর্য সরাসরি মাথার উপর অবস্থান করার সময় (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩১; মিশকাত, হা/১০৪০)। তবে কুরআন তেলওয়াতের জন্য নিষিদ্ধ কোনো সময় নেই। কেননা নিষিদ্ধের ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ মর্মে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি। বরং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সূর্য উদিত হওয়ার সময় কুরআন তেলাওয়াতের পক্ষে আমল প্রমাণিত হয়েছে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জামা’আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকির করবে এবং এরপর দুই রাকা’আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও উমরা পালনের ছওয়াব হবে। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য হজ্জ ও উমরার পরিপূর্ণ ছওয়াব হবে, পরিপূর্ণ ছওয়াব হবে, পরিপূর্ণ ছওয়াব হবে’ (তিরমিযী, হা/৫৮৬; মিশকাত, হা/৯৭১)।

বিদ’আত

প্রশ্ন (২২) : ইজতিহাদ আর বিদ’আতের মধ্যে পার্থক্য কি?

-ফাহিম মাহমুদ
গাইবান্ধা।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে বিদ’আত হলো প্রত্যাখ্যাত বিষয় আর ইজতিহাদ হলো সম্পূর্ণ শরীয়ত স্বীকৃত বৈধ বিষয়। বিদ’আত

হলো- দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করা যা শরীয়া সমর্থিত নয়। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; মিশকাত, হা/১৪০)। আর দলীলসহকারে শরীয়তের সঠিক বিধানে পৌঁছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার নাম ইজতিহাদ। আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, ‘যদি কোনো কোনো আলেম বা বিজ্ঞ বিচারক ফায়ছালা করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে অতঃপর সঠিকতায় পৌঁছে, তাহলে সে দ্বিগুণ নেকি পাবে। আর যদি সে ফায়সালা করে সঠিক বিধানে পৌঁছার চেষ্টা করে অতঃপর ভুল করে বসে, তাহলে সে একটি নেকি পাবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৬)।

বৈধ-অবৈধ

প্রশ্ন (২৩) : ফেসবুক, মেসেঞ্জারে বিভিন্ন প্রাণির ছবিযুক্ত ইমোজি ব্যবহার করা হয়, তাতে কি গুনাহ হবে?

-মো. নাহিদ আলী
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ফেসবুক বা মেসেঞ্জারে যেসব ইমোজি ব্যবহার করা হয় তা মূলত ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের থেকে আসা কুসংস্কার ও সুকৌশলে মুসলিমদেরকে ছবি-মূর্তির মত ভয়াবহ পাপে যুক্ত করার এক চক্রান্ত। সুতরাং প্রাণির আকৃতি ও ছবিযুক্ত কোনো ইমোজি ব্যবহার করা যাবে না। রাসূল ﷺ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন ঐ সকল মানুষদের সব চাইতে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ কিছু তৈরি করত (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৭)।

প্রশ্ন (২৪) : আমার একটি ছাগলের খামার আছে। ছাগলের খাবারের জন্য ফসল উঠার সময়ে গম ও ভুট্টা কিনে রাখতে হয়। খামারের জন্য বছরে লাগে ২০ মণ। আমি যদি ১০০ মণ কিনে রাখি বাকি ৮০ মণ দাম বাড়লে বিক্রি করব। এতে কি পাপ হবে?

-মহিদুল ইসলাম
বিসমিল্লাহ গোট ফার্ম, যশোর।

উত্তর : বাজারে কৃত্রিম সংকট তথা সিন্ডিকেট তৈরি উদ্দেশ্য না হলে এবং বাজারে চাহিদা পরিমাণ পণ্য মজুদ থাকলে সাময়িকভাবে পণ্য গুদামজাত করণে কোনো সমস্যা নেই। বরং এমন গুদামজাতের ফলে খাদ্য সংকটের সময় মানুষ সহজে পণ্য হাতে পেয়ে থাকে। সুতরাং এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। (আল-মুগনী, ‘ইবনু ক্বুদামা’, ৬/৩১৭)। আর সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করা যায়। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ নবী ﷺ বনু নাযীরের খেজুর বিক্রি করতেন এবং তার পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জোগাড় করে রাখতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৫৭)। তবে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার উদ্দেশ্যে, পণ্যের মূল্য আকাশ চুম্বি করার লক্ষ্যে পণ্য গুদামজাত করা হারাম এবং অভিসাপের কাজ। সুতরাং এমন উদ্দেশ্যে খাদ্য গুদামজাত করা যাবে না। মা’মার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘গুনাহগার ছাড়া কেউ পণ্য গুদামজাত করে না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)।

প্রশ্ন (২৫) : বকেয়া টাকা উত্তোলনের জন্য হালখাতা করা যাবে কি?

-এহসানুল হক
কুলনিয়া, দোগাছি, পাবনা সদর।

উত্তর : হালখাতা ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান নয় বরং ব্যবসার একটি কৌশল মাত্র। সুতরাং হালখাতা অনুষ্ঠান যদি কোনো দিন, মাস, বছর নির্দিষ্ট না করে নিছক ব্যবসায়ীক সুবিধার্থে করা হয় এবং তা সকল প্রকার গান-বাজনা, জুলুম, প্রতারণা ও শরীয়ত বিরোধী কর্ম-কাণ্ড মুক্ত হয়, তাহলে বকেয়া টাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে হালখাতা করাতে শারঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কর্য পরিশোধের আশায় কর্য গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে কর্য পরিশোধ করার সুযোগ দান করেন। আর যে ব্যক্তি এই আশায় কর্য গ্রহণ করে না, আল্লাহ তার কর্য পরিশোধের সুযোগ করে দেন না’ (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৮৭; মিশকাত, হা/২৯১০)।

প্রশ্ন (২৬) : শখের বশে কুকুর পোষা বৈধ কি?

-আব্দুস সাত্তার
নোয়াখালী।

উত্তর : পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে শখের বশে বাড়িতে কুকুর পোষা বৈধ নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩২২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮১৫; মিশকাত, হা/৪৪৮৯)। ‘যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে, যা শিকারের জন্য নয়, পশু রক্ষার জন্য নয় এবং ক্ষেত পাহারার জন্যও নয়, সে ব্যক্তির নেকি থেকে প্রত্যেক দিন (এক অথবা দুই ক্বীরাত পরিমাণ ছওয়াব কমে যায়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৭৫)।

প্রশ্ন (২৭) : মেয়েদের সামনের চুল কাটা যাবে কি?

-সুমাইয়া আক্তার মিম
দক্ষিণখান, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত: মেয়েদের শুধুমাত্র সামনের চুল কাটা যাবে না। কেননা চুল লম্বা রাখা মেয়েদের বৈশিষ্ট। রাসূল ﷺ-এর

যুগেও নারীদের চুল লম্বা ছিল। উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাথার বেনী তো খুবই মোটা এবং শক্ত। আমি কি জানাবাতের গোসলের জন্য তা খুলে ফেলব? তিনি বললেন, না। তোমার মাথায় কেবল তিন আজলা পানি ঢেলে দিলেই চলবে। এরপর তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিবে। এ ভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩০; মিশকাত, হা/৪৩৮)। মৃত নারীদের কেশ লম্বা থাকার কারণে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত নারীদের চুল তিনভাগ করে পিছনে রেখে দিতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১২৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯)।

দ্বিতীয়ত: বর্তমানে নারীদের চুল ছোট করার যে পদ্ধতি তা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যশীল। আর বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি বিজাতীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)। তবে চুল কাটতে চাইলে পিছন দিক থেকে সমানভাবে চুলের কিছু অংশ কাটতে পারে (ছহীহ মুসলিম, হা/৩২০)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৮) : আমার পিতা শুটকী কিনেছিলেন যার ৭০% টাকা হালাল, আর ৩০% টাকা হারাম। এখন ঐ পরিমাণ শুটকী যদি আমি তাদের অগোচরে কাওকো দান করে দেই, তাহলে এর কারণে আমি কি গুনাহগার হবো? (যেহেতু তাদেরকে হারামের কথা বললে রাগারাগি করবেন)। আর দান করার কারণে বাকি শুটকীগুলো কি হালাল হবে?

-আমাতুল্লাহ

কবিরহাট, নোয়াখালী।

উত্তর : টাকার পরিমাণ বেশি হলে পিতার অনুমতি ব্যতীত কোনো ক্রমেই ছেলে দান করতে পারবে না। যদিও তা হালাল-হারাম মিশ্রিত হয়। বরং সে তার পিতাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে যদিও এতে তার পিতা রাগারাগি করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ন্যায়ের ব্যাপারে আদেশ কর এবং অন্যায় হতে বিরত রাখ' (আল-ইমরান, ৩/১১০)। তবে পিতা যদি বারবার দাওয়াত দেওয়ার ভিত্তিতে ফিরে আসেন এবং হারাম অংশ ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে হারাম অংশ দান করে দেন তাহলে সব হালাল হয়ে যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৬৪; মিশকাত, হা/৩৩৪২)। অতএব এমন অবস্থাতে ছেলের কর্তব্য হবে তার কাছে হালাল হারামের বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানানো। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করো এবং সৎ কর্ম করতে থাকো (আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)। এরপর যদি পিতা হারাম অংশটুকু আলাদা করতে সক্ষম হন এবং জনসেবা মূলক কাজে ব্যয় করে দেন তাহলে বাকিটুকু পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২৯) : ছালাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কি কুরবানির পশু যবেহ করতে পারবে? বা তিনি যবেহ করলে কি সেই পশুর গোশত হালাল হবে?

আব্দুল্লাহ

রাজশাহী।

উত্তর : ব্যক্তি যদি ছালাত আদায় করা যাবে না বিশ্বাস করে ছালাত ত্যাগকারী হয় অথবা ছালাতকে অস্বীকার করে ছালাত ত্যাগকারী হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির যবেহ করা জীব-জন্তু খাওয়া যাবে না। কেননা এমন ব্যক্তি মুরতাদ 'ইসলাম ত্যাগকারী'। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করল যে কুফুরী করল' (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/১৪৬৩; কুবরা বায়হাক্বী, হা/৬৭৩৪)। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ 'মু'মিন এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো ছালাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮২; মিশকাত, হা/৫৬৯)। আর যদি অলসতার কারণে ছালাত ত্যাগকারী হয়, তাহলে এমন ব্যক্তির যবেহ করা পশু খাওয়া যায়।

চাকুরী-কর্মসংস্থান

প্রশ্ন (৩০) : সম্প্রতি জনৈক মুফতি বলেছেন, ট্যাক্স হারাম তাই ট্যাক্সের চাকুরীও হারাম। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইশতিয়াক আহমেদ

হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ জেলা।

উত্তর : অসহায়-দরিদ্রদের সহযোগিতা, গৃহহীন ও বস্ত্রহীনদের গৃহ ও বস্ত্রের ব্যবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইসলামে রয়েছে যাকাত ব্যবস্থা। যা প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির উপর ফযর। আর ট্যাক্স একটি সরকারী নীতিমালা। কেউ কোনো দেশে বসবাস করতে চাইলে, সে দেশের সুবিধা ভোগ করতে চাইলে, সে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করতে চাইলে সে দেশের কিছু নীতিমালা ও শর্ত রয়েছে এবং সে নীতিমালা ও শর্তগুলো মেনে সে দেশের সুবিধা ভোগ করা যায়। সুতরাং বসবাসের স্বার্থে যে সমস্ত নিয়ম ও শর্ত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, হারামকে হালালকারী নয় তা একজন বহিরাগত ব্যক্তির মান্য করা ভালো। তবে দেশীয় নাগরিকদের উপর ট্যাক্স আরোপ করা জুলুম। সুতরাং ট্যাক্সের চাকুরী থেকে বিরত থাকা ভালো। উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ট্যাক্স প্রদান করলেও মুসলিমদেরকে সম্পদের যাকাত প্রদান করতে হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯)।

প্রশ্ন (৩১) : বাংলাদেশে যে ব্যাংকগুলোর শরীয়া বোর্ড আছে ঐ সকল ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কি চাকুরী করা যাবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন

ঝিনাইদাহ, বদরগঞ্জ।

উত্তর : বাংলাদেশের সকল ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে জড়িত। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সূদ

নির্ভর। বিধায় যে সকল ব্যাংকগুলোর শরীয়া বোর্ড আছে বলে দাবী করে থাকে তবুও সেগুলো পরিপূর্ণভাবে সূদ মুক্ত নয়। তাই সে সকল ব্যাংকে চাকুরী করা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন। ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ সূদগ্রহনকারী ও প্রদাণকারী ও এর সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সকলকেই লানত করেছেন' (জামেউছ ছাগীর, হা/৯২২৫)। অতএব এ ক্ষেত্রে সকলের কর্তব্য হবে হারামের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না করে, হালাল পন্থায় রিযিক্ব অন্বেষণ করা।

প্রশ্ন (৩২) : মেয়েদের হসপিটালে মিডওয়াইফারি চাকুরী করা যাবে কি-না?

-তামিমা আক্তার
রামপাল, বাগেরহাট।

উত্তর : মিডওয়াইফারি অর্থ হচ্ছে ধাত্রীবিদ্যা বা প্রসূতিতন্ত্র। প্রসূতি নারীদের সেবা প্রদান করাকে মিডওয়াইফারি বলা হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন নারী এই পেশায় যোগদান করে। তারা একজন মহিলাকে গর্ভ ধারন থেকে শুরু করে বাচ্চা প্রসব করার ৪২ দিন পর পর্যন্ত সার্বিক সেবা-শুশ্রূষা প্রদান করার পাশাপাশি নরমাল ডেলিভারির জন্য কাজ করে থাকে। ইসলামে সংসারের সকল আর্থিক ইনকামের দায়-দায়িত্ব পুরুষের। তবে নারীর জন্য ইনকাম করা যেমন জরুরী নয় তদ্রূপ হারামও নয়। তাই নারীরা চাইলে বৈধ যেকোনো চাকুরী ইসলামের বিধি-বিধান মেনে করতে পারে। একজন নারী চাকুরী করার জন্য ইসলাম কিছু শর্ত দিয়েছে। ১. পূর্ণ পর্দা পালন করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে আর মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দিন- তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ীর বাইরে যায়), এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না' (আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ 'তারা যেনো তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে না বেড়ায়' (আন-নূর, ২৪/৩১)। ২. নারীর জন্য পৃথক কর্মসংস্থান থাকা। অর্থাৎ একজন নারী পুরুষের সহবস্থানে চাকুরী করতে পারবে না। কেননা বেগানা নারী-পুরুষের সহবস্থান হারাম। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যখন কোনো স্ত্রী লোকের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করে তখন তাদের মাঝে অবশ্যই তৃতীয় জন হিসাবে থাকে শয়তান' (তিরমিযী, হা/১১৭১; মিশকাত, হা/৩১১৮)। এই সকল বিধান মেনে মিডওয়াইফারিসহ যেকোনো বৈধ চাকুরী নারীরা করতে পারে।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ

প্রশ্ন (৩৩) : আপন চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আজিজুল
মালোশিয়া।

উত্তর : চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে। কারণ সে মুহাররামাতের (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) অর্ন্তভুক্ত নয়। যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সে সব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যে সব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা' (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে) (আন-নিসা, ৪/২৩)।

প্রশ্ন (৩৪) : ফাতিমা ও যয়নব সহোদরা দুই বোন। যয়নব জীবিত থাকাবস্থায় তার স্বামী কি ফাতিমার মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে?

-আতাউল্লাহ
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : স্ত্রীর বোনের মেয়েকে এবং তার মেয়ের মেয়েকে এভাবে অধঃস্তনের যে কাউকে বিয়ে করা হারাম (তাফসীরে কুরতুবী, ৫/১০৮; ফাতহুল ক্বাদীর, ২/১১২)।

পারিবারিক বিধান- পরিবারের ব্যয়ভার

প্রশ্ন (৩৫) : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের চিকিৎসা খরচ বহন করতে কৃপণতা করেন, তাহলে তার ব্যাপারে শারঈ হুকুম কী?

-আব্দুল্লাহ
নিলফামারী।

উত্তর : সামর্থ্যবান পরিবার প্রধানের উপর স্বীয় পরিবারের সকল সদস্যের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেখাপড়া, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব (তালাক, ৬৫/৬; আল-বাক্বারা, ২/২৩৩)। তাই উক্ত ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালনে কৃপণতা করলে নিঃসন্দেহে গুনাহগার হবেন। রাসূল ﷺ বলেন, 'একজন ব্যক্তি পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে খানা-পিনার ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদেরকে যথাযথ দেখাশুনা করবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৯৬; আবূ দাঊদ, হা/১৬৯২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৪৯৫)। তবে অনেক সময় পরিবারের কোনো সদস্য অপ্রয়োজনীয় খরচকে প্রয়োজনীয় বলে কিছু দাবি করতে পারে, আর সে ক্ষেত্রে পরিবার প্রধানকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কেননা উহা অপচয় আর অপচয় করা হারাম (আল-ইসরা, ১৭/২৬; ছহীহ বুখারী, হা/১৪৭৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৫৬০)।

মৃত্যু পরবর্তী করণীয়

প্রশ্ন (৩৬) : আপনজন বাড়িতে মারা যাওয়ার পর জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের করণীয় কী? কুরআন তেলাওয়াত, দরূদ পাঠ ইত্যাদি করা কি শরীয়া সম্মত?

-রেজওয়ান ইসলাম

ঢাকা।

উত্তর : কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজনদের উপর কর্তব্য হলো, মৃতের পরিবারের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের সান্ত্বনা দেওয়া, বিলাপ না করা, মৃত ব্যক্তির জন্য দান-ছাদাক্বা ও দু'আ করা। আসমা বিনতে উমায়েস (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, যখন জা'ফর মুতার যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শহীদ হলেন, তখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পরিবারের নিকট গেলেন এবং বললেন, 'জা'ফরের পরিবার মর্মাহত, তোমরা তাদের জন্য খাবার তৈরি করো' (ইবনু মাজাহ, হা/১৬১১)। মুগীরা ইবনু শু'বা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি, যার জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হয় ক্বিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩৩; মিশকাতন, হা/১৭৪০)। উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃতের দাফন কার্য সম্পন্ন হলে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং অটল থাকার দু'আ করো। কেননা, তাকে এখন কবরে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে (তিরমিযী, হা/৩২২১; মিশকাত, হা/১৩৩)। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা, দরূদ পাঠ করা, কুলখানী-চল্লিশার অনুষ্ঠান করা এসবই বিদ'আত। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার মধ্যে নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (৩৭) : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কতদিন বাড়ির বাইরে বের হতে পারবে না?

-মোনোয়ার হোসেন

শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪ মাস ১০দিন বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করবে' (আল-বাক্বারা, ২/২৩৪)। আর স্ত্রী গর্ভকালীন অবস্থায় স্বামী মারা গেলে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। (আত-তালাক, ৬৫/৬)। তবে জরুরী কারণে বাইরে যেতে পারে। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার খালাকে তালাক দেওয়ার পর তিনি তার খেজুর বাগানে যেতে চাইলেন। পথে এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হলে সে তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করল। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট গেলে, তিনি বললেন, 'তুমি গিয়ে তোমার খেজুর নিয়ে এসো। হয়তো তুমি ছাদাক্বা করবে এবং মানুষের উপকারের জন্য দিয়ে দেবে (নাসাঈ, হা/৩৫৫০)।

ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন (৩৮) : কৃষি জমি হতে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের সবজি যেমন. আখ, কলা, রসুন, পিঁয়াজ, মুলা ইত্যাদি বিক্রয়ের যোগ্য হওয়ার পর কৃষক জমিতে থাকাবস্থায় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। পরবর্তীতে ব্যবসায়ীরা জমি থেকে উঠিয়ে বাজারে বিক্রয় করে। এমন ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

-মো. নাহিদ আলী

চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, বৈধ হবে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফল-মূল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরগাছে খেজুর রেখে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ তা খাওয়ার উপযুক্ত না হয়। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে জিজ্ঞাসা করা হল, উপযুক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেন, লাল অথবা হলুদ বর্ণ ধারন করা (ছহীহ বুখারী, হ/২১৯৭)। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, ফল-ফসল খাওয়ার উপযুক্ত হলে গাছে রেখে বিক্রি করা যায় এবং ব্যবসায়ী তার ইচ্ছামতো গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে বিক্রি করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৯) : বাকিতে বেশি দামে এবং নগদে কম দামে বিক্রি করা বৈধ হবে কি?

-এহসানুল হক

পাবনা সদর।

উত্তর : বাকিতে বেশি ও নগদে কম এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে بيع تقسيط বলা হয়। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক নিয়ম হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পক্ষ সন্তুষ্ট থাকা। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী, 'তবে যদি তোমরা ব্যবসার ক্ষেত্রে পরস্পরে সন্তুষ্ট থাক' (আন-নিসা, ৪/২৯)। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, বাকিতে যদি বেশি নেওয়া হয় এবং তাতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এমন ক্রয়-বিক্রয় ছহীহ বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে রাসূলের হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আমরকে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার ব্যাপারে আদেশ করেন। এরপর উট শেষ হয়ে গেলে তিনি ছাদাক্বার উট হতে দুইটি উটের বিনিময়ে একটি উট গ্রহন করেন (মুসতাদরাকে হাকেম, হা/২৩৪০; দারাকুৎনী, হা/৩০৯৬)। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে بيع السلام এর প্রতি। যা بيع تقسيط এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যার হুকুমের ব্যাপারে চার ইমাম জায়েয বলেছেন (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/১০৮; ওয়াজিয লিল গাযালী, ১/৮৫; ফতওয়া ইবনু তায়মিয়্যা, ২৯/৪৯৯; বাদায়িয়ুছ ছানায়ি', ৫/১৮৭)।

সূদ-ঘুষ

প্রশ্ন (৪০) : আমি যদি বিদেশে যাই তাহলে আমার পিতা সূদের উপর ঋণ নিয়ে আমাকে বিদেশ পাঠাবে। আবার আমি বিদেশ থেকে টাকা পাঠালে ঋণ পরিশোধের জন্য আমার পিতা ঐ সূদযুক্ত ঋণ পরিশোধ করবে। আমার প্রশ্ন হলো এই কাজগুলো হলে আমার কি সূদের পাপ হবে না-কি শুধু আমার পিতার হবে? না-কি দুজনেরই হবে?

-আল আমিন

সাভার।

উত্তর : এই অবস্থায় পিতা-পুত্র দুজনেই পাপী হবে। এর মধ্যে পুত্রই মূলত আসল পাপী হবে। কারণ পিতা ঋণ করলেও তা মূলত পুত্রের জন্যই ঋণ নেওয়া। আর পিতা সহযোগিতার

www.al-itisam.com

কারণে পাপী হবে। কারণ মন্দ কাজে সহযোগিতা করাও মন্দ (আল মায়েদা, ৫/২)। আর সূদের উপর টাকা নিয়ে বিদেশ না যাওয়ায় ভালো। দেশে অল্প আয়ের হালাল কাজ করে ডাল-ভাত খেয়ে জীবনধারণ করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন (৪১) : আমি জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর থেকে পরিবার সঞ্চয়পত্র কিনতে চাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমি যদি ৫০ হাজার টাকা সমমূল্যের সঞ্চয়পত্র কিনি তাহলে, ৫ পছর পর আমি মুনাফা পাব ২৮৮০০ টাকা এবং সরকারী কর বাদে পাব ২৭৩৬০ টাকা। আমার প্রশ্ন হলো, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর থেকে সঞ্চয় পত্র কেনা কতটুকু শরীয়া সম্মত? এটা কি আমার জন্য হালাল হবে?

-মো. আমিনুল হক

ঢাকা।

উত্তর : না, হালাল হবে না। কেননা, এ ধরনের লেনদেন সূদের অন্তর্ভূক্ত। মহান আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান হাতে হাতে লেনদেন করা যায়। তবে যে ব্যক্তি বেশি দিল বা চাইল সে নিজেকে সূদের সাথে জড়িত করল। এ ক্ষেত্রে সূদ গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান অপরাধী’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৪)।

প্রশ্ন (৪২) : আমার ১৮ বছর মেয়াদী লাইফ ইন্সুরেন্সের বর্তমান মেয়াদ ৬ বছর। এই ইন্সুরেন্সের জন্য যাকাত দিতে হবে কি? উল্লেখ্য যে, লাইফ ইন্সুরেন্স যখন তখন ভাঙ্গা যায় না। আর অনেক ঝামেলা করে ভাঙ্গলেও পুরো টাকা ফেরত পাওয়া যায় না। মূলধন থেকে অনেক টাকা কেটে রাখা হয়।

-এনামুল হক্ব

মাটুঈল, ঢাকা।

উত্তর : কোনো লাইফ ইন্সুরেন্স সূদ মুক্ত নয়। তাই ইসলামী শরীয়তে লাইফ ইন্সুরেন্স বৈধ নয়। কেননা ইসলামে সরাসরি সূদী কারবার যেমন হারাম তদ্রূপ তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাও হারাম। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন, ‘সূদ গ্রহীতার উপর, সূদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও উহার সাক্ষীদ্বয়ের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান অপরাধী’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮)। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব লাইফ ইন্সুরেন্স থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। লাইফ ইন্সুরেন্সে রাখা টাকা যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং তাতে পূর্ণ এক বছর অতিক্রম হয়ে থাকে তাহলে, মালিককে সূদ বাদে মূল অর্থের যাকাত প্রদান করতে হবে’ (আবূ দাউদ, হা/১৫৭৩; মিশকাত, হা/১৭৮৭)।

শারঈ চিকিৎসা- ঝাড়ফুঁক

প্রশ্ন (৪৩) : জীনে ধরা ব্যক্তির চিকিৎসা করার শারঈ মাধ্যমগুলো কী?

-নাঈম ইসলাম

দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : জীনে ধরা ব্যক্তির চিকিৎসা ও জীনের ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো সুন্নাহ পদ্ধতিতে আমল করতে হবে এবং শেখানো দু’আগুলো পাঠ করতে হবে, তাহলে জীনের ক্ষতি হতে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশা-আল্লাহ। ১. রাত্রে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ঠতা হতে রক্ষা করবেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৩১১; তিরমিযী, হা/২৮৮০; মিশকাত, হা/২১২০)। ২. সূরা ইখলাছ ও সূরা নাস বেশি বেশি পাঠ এবং প্রয়োজনে শরীরে ফুঁক দেওয়া (তিরমিযী, হা/২০৫৮; মিশকাত, হা/৪৫৬৩)। ৩. সূরা ফাতেহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করা। ৪. বাড়িতে নিয়মিত সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করিওনা। নিশ্চয় ঐ বাড়ি হতে শয়তান পলায়ন করে, যে বাড়িতে সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত করা হয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮০; মিশকাত, হা/২১১৯)। ৫. প্রতি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪০০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৭)। ৬. প্রতি দিন একশতবার নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করা। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু‘আটি প্রতিদিন একশতবার পাঠ করবে আল্লাহ তাকে একশত অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা করবেন এবং শয়তান হতে রক্ষা করবেন’। : مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৩৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯১)। এছাড়াও শিরক নেই এমন জিনিস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা যায়। আউফ ইবনু মালেক আল-আশজাঈ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে ঝাড়ফুঁক করতাম। অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, ‘তোমাদের ঝাড়ফুঁকের বাক্যগুলো আমার সামনে পেশ করো; তবে যেসব ঝাড়ফুঁক শির্কের পর্যায়ে পড়ে না, তাতে কোনো দোষ নেই’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২২০০; মিশকাত, হা/৪৫৩০)।

স্বপ্ন-ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৪) : জনৈক বক্তা বলেছেন , স্বপ্নে দুধ খেলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় (এ মর্মে তিনি রাসুল ﷺ-এর স্বপ্নে দুধ খাওয়ার একটি হাদিছ বলেছেন), স্বপ্নে কাক দেখলে খারাপ কিছুর ইঙ্গিত বুঝায়, ইত্যাদি। আসলেই কি 'কুরআন ও হাদিছে' এ ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা আছে?

-সোহানুর রহমান
পার্বতীপুর, দিনাজপুর

উত্তর : রাসূল ﷺ কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। যেমন: লম্বা জামার ব্যাখ্যা করেছেন দ্বীন, দুধ পানের ব্যাখ্যা করেছেন ইলম ইত্যাদী (মিশকাত, হা/৬০৩০; ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৮১; মুসলিম, হা/২৩৯০)। মু'মিনের স্বপ্নকে নবুয়তের এক ছেচল্লিশ অংশ বলা হয়েছে। উবাদা ইবনু ছামেত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ 'মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৮৭)। তবে ব্যক্তির স্বপ্ন শারঈ দলীল নয়। উল্লেখ্য যে, ভালো স্বপ্ন প্রিয় মানুষকে বলা যায়। তবে খারাপ স্বপ্ন কাওকো বলা যাবে না। বরং নিম্নোক্ত আমল করবে। আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন ভীতিকর মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে আর শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে এরূপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৬১৭)। উল্লেখ্য যে, স্বপ্নে কাক দেখলে খারাপ কিছুর ইঙ্গিত বোঝায় এমন ঘটনা বানোট এবং ভিত্তিহীন।

পোষাক-পরিচ্ছদ

প্রশ্ন (৪৫) : পুরুষের জন্য কোন রঙের পোষাক পরিধান করা হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মো. মামুন মাহমুদ
শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : হলুদ কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে হলুদ রঙের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখলেন এবং বললেন, এগুলো হলো কাফেরদের পোশাক। অতএব তা পরিধান করো না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২০৭৭; মিশকাত, হা/৪৩২৭)। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে দুইটি হলুদ রঙের কাপড় পরা অবস্থায় দেখলেন এবং বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এ কাপড় পরার আদেশ করেছেন? আমি বললাম, আমি ধুয়ে নিব। তিনি বললেন, না, বর; পুড়িয়ে ফেলো (ছহীহ মুসলিম, হা/২০৭৭; মিশকাত, হা/৪৩২৭)। শুধু এক কালার/নিরেট লাল রঙের কাপড় না পরাই ভালো। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। আমি বলিনি, তিনি তোমাদের স্বর্ণের আংটি, রেশম মিশ্রিত কাপড় যা মিছরে তৈরী হয়, লাল-হলুদ মিশ্রিত কাপড় পরতে ও রুকূতে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন (নাসাঈ, হা/৫১৭৩)। তবে হালকা লাল রং মিশ্রিত কাপড় পরা যায়। হেলাল ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে মিনার মাঠে খচ্চরের পিঠে চড়ে খুৎবা দিতে দেখেছি। তখন তার পরনে ছিল লাল রং মিশ্রিত একটি চাদর এবং আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর সামনে তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করছিলেন (আবূ দাঊদ, হা/৪০৭৩; মিশকাত, হা/৪৩৬৩)।

হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৬) : ছহীহুল জামে', হা/৩৯০৯-এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-গোলাম ছামদানী
নোয়াখালী।

উত্তর : প্রশ্নোল্লেখিত হাদীছটি হলো-'একজনের খাবার দুইজনের এবং দুইজনের খাবার চারজনের জন্য এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যতেষ্ট'। উক্ত হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- একজনের পরিতৃপ্ততা দুইজনের খাদ্যের সমান এবং দুইজনের পরিতৃপ্ততা চারজনের খাদ্যের সমান। সাথে সাথে হাদীছে এটাও প্রমাণ করে যে, দলবদ্ধভাবে খাওয়ার মাঝে বরকত রয়েছে (তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/৪৪৪ পৃ.; মিরকাতুল মাফাতীহ, ৭/২৬৯৯ পৃ.)। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উক্ত হাদীছে খাবারের ব্যাপারে সহযোগিতার প্রতি উৎস প্রদান করা হয়েছে। যদিও তা অল্প হয়, যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং খাবারে বরকত অর্জিত হবে যা উপস্থিত সকলকে অন্তর্ভূক্ত করবে (শারহুন নববী আলা মুসলিম, ১৪/২৩)।

প্রশ্ন (৪৭) : ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে মানসূখ বা রহিত হওয়া হাদীছ আছে কি? ২. যদি থেকে থাকে তাহলে, হাদীছ শাস্ত্রে রহিত বা মানসূখ হওয়া হাদীছের প্রয়োজনীয়তা কী?

-আব্দুল্লাহ হাসিব
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : ছহীহ বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে মানসূখ বা রহিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে রহিত হাদীছ বর্ণনা করার প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে- মানুষকে অবগত করানো যে অত্র

হাদীছটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা যদি তা উল্লেখ্য করা না হয় তাহলে, মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হবে এবং আমলের ক্ষেত্রে বিবাদের সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত: পূর্বের বিধান রহিত করে নতুন বিধান দেওয়ার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে- (১) মুমিনদের উপর সহজতা আরোপ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে (দায়িত্বভার) হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে' (আল-আনফাল, ৮/৬৬)। (২) দায়িত্বপ্রাপ্তদের পরীক্ষা করা যে তারা তা বাস্তবায়ন করছে কি করছে না; যেমন কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা। (৩) নিয়মের ব্যাপারে অবহেলাকারীদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ইয়াহূদীদের বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণের জন্যে (এমন) অনেক পবিত্র জিনিসও আমি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম যেটা তাদের জন্য আগে হালাল ছিল' (আন-নিসা, ৪/১৬০)। (৪) বান্দাদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে। (৫) কঠোর বিধানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে হালকা করা যেমন: মদ হারামের বিষয়টি।

প্রশ্ন (৪৮) : জনৈক আলেম থেকে শুনেছি, একদা একজন লোক এসে রাসূল ﷺ-এর নিকট বলল যে, তিনি তার স্ত্রীকে যেনা করতে দেখেছে, এখন সে কি করবে? তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমার কাছে প্রমাণ আছে? তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ঐ ব্যক্তিকে আমার স্ত্রীর সাথে যেনা করতে শুধু আমি দেখেছি। তখন রাসূল ﷺ তাকে তা গোপন রাখতে বললেন। প্রশ্ন হলো- আদৌ কি এমন কোনো হাদীছ আছে? হাদীছ নাম্বারসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাফিয়ান আব্দুল্লাহ
রাজবাড়ি সদর।

উত্তর : আমরা হুবুহু উল্লিখিত শব্দে হাদীছ অবগত হতে পারিনি। তবে এর সমর্থনে বর্ণিত দুটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ্য করা হলো- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ « نَعَمْ ». আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কাউকে দেখতে পাই, তাহলে চারজন সাক্ষী যোগাড় করা পর্যন্ত আমি কি তাকে অবকাশ দেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৯৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০০০৮; মুয়াত্ত্বা মালেক, হা/২৭৩০)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, একদা হিলাল ইবনু উমাইয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ-এর নিকট শারীক ইবনু সাহমা'র সাথে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ করলে নবী ﷺ বললেন, 'তুমি প্রমাণ পেশ করো অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) কার্যকর হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সম্ভব? এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে অবৈধ কাজে লিপ্ত দেখে সে সাক্ষীর খোঁজে বের হবে? নবী ﷺ আবারও বললেন, তুমি সাক্ষী পেশ করো, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দ কার্যকর হবে। হিলাল উবনু উমায়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আমি আমার দাবীতে অবশ্যই সত্যবাদী। নিশ্চয় আল্লাহ আমার বিষয়ে অবতীর্ণ করবেন। যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো- 'এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর যিনার অভিযোগ দেয় অথচ তাদের কাছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষী নেই...' (আবূ দাউদ, হা/২২৫৪; ইবনু মাজাহ, হা/২০৬৭)। উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বিষয়টি গোপন রাখতে বললেন' এমন বাক্য কোনো হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে এমনটি বুঝা যায়।

ইতিহাস

প্রশ্ন (৪৯) : ইসলামের দুশমন আবূ লাহাবের মৃত্যু এবং কাফন-দাফন কিভাবে হয়ে ছিল?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : তার কাফন-দাফন কিভাবে হয়েছিল তা প্রমাণিত সূত্রে জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ এইভাবে লিখেছেন: ইসলামের দুশমন আবূ লাহাব বদর যুদ্ধের প্রায় সাত দিন পরে 'আদাসা' নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে (তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক)। এরপর তাকে দুই বা তিন দিন পর্যন্ত কাফন-দাফন না করা হলে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। এরপর তার প্রতি অসম্মানের দিকে লক্ষ্য করে একটি গর্ত খনন করে তাকে কাঠির সহযোগিতায় সেখানে ফেলে দেওয়া হয় এবং দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এভাবেই তার কাফন-দাফন সমাপ্ত হয় (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, হা/১০০১৪; ত্বাবারানী, ১/৩০৮ পৃ.)।

প্রশ্ন (৫০) : আমি ছোটবেলায় শুনেছি যে, ২ জন ইয়াহূদী রাসূল ﷺ-এর লাশ চুরির চেষ্টা করে। এই কাহিনী কি সত্যি, না-কি নিছক এক কাহিনী?

-নিলুফার নার্গিস
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর লাশ চুরির ঘটনা বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে এর স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র পাওয়া যায় না।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

পাশাপাশি ই-ফেতনার ভয়াল থাবা পড়েছে আমাদের দেশের কিছু তরুণ তালেবে ইলম। এদের মধ্যে জ্ঞান-গরীমায় ভালো কেউ নেই তা নয়; তবে অধিকাংশের অবস্থা চরম শোচনীয়। কিন্তু আত্মপ্রচারের তীব্র বাসনা তাদেরকে একেবারেই নিচে নামিয়ে দিয়েছে। জ্ঞান অর্জনের চিন্তা নেই, কোনো চেষ্টা-তদবীর নেই, আছে শুধু সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য বক্তব্য অনুশীলনের হীন প্রচেষ্টা। এদের মাধ্যমে জাতির কাছে কিছু ভালো কথা গেলেও অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ে ভুল তথ্য চলে যাচ্ছে। ফলে সার্বিক বিচারে জাতির বিপথগামী হওয়ার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

ইলমী অঙ্গনে ই-ফেতনার সবচেয়ে ভয়ংকর একটি দিক হলো- অতি আবেগী কিছু তরুণ তালেবে ইলম দেশের বড় বড় উলামায়ে কেরামের 'পান থেকে চুন খসলেই' তাদের ক্ষেত্রে এমন শব্দ প্রয়োগ করা শুরু করেছে, যা রীতিমতো উলামায়ে কেরামের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। আলেমদের কথা শুনে সাধারণ মানুষ আমল করবে, কিন্তু এর ফলে উল্টো আলেমদের প্রতি অনাস্থা তৈরি হচ্ছে। বুদ্ধিহীন অবিবেচক এসব তরুণরা দেশের কোনো আলেমকে ছাড় দিচ্ছে না। কোনো না কোনো দিক থেকে সমালোচনা করে তাদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। এমন কোনো আলেম পাওয়া দুষ্কর হবে, যার সমালোচনা করা হয়নি বা হচ্ছে না। ফলে আরবী না জানা জেনারেল শিক্ষিত সমাজ এবং সাধারণ মানুষ আজ সমালোচনাহীন অনুসরণীয় কোনো আলেম পাচ্ছে না। ফলস্বরূপ সমাজের অধিকাংশ মানুষ আজ আলেমবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যা উম্মাহকে ভয়াবহ এক ক্ষতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনলাইনে এক আদর্শের লোক অন্য আদর্শের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে গালি-গালাজ করছে। নিজের মতের চেয়ে সামান্য ভিন্ন মত কেউ ব্যক্ত করলেই তিলকে তাল বানিয়ে সোস্যাল মিডিয়া গরম করা কিছু মানুষের নেশা ও পেশায় পরিণত হয়েছে। অন্যের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারাটাই এদের কাছে যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ইলমী ময়দানের অর্বাচীন তালেবে ইলমগুলো নিজের যোগ্যতার লেভেল বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে ইসলামী আক্বীদা-আদর্শ লালনকারী লোকগুলো আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং এই বিভক্তি পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অতি আবেগী এই ভাইয়েরা এই বিভক্তির ক্ষেত্রে তাদের দায় কোনোভাবে এড়াতে পারবে কি-না তা গভীরভাবে ভাবা উচিত।

অস্ত্র দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা যায়, আবার সন্ত্রাসও নির্মূল করা যায়। তাই আসুন! ইন্টারনেটকে অভিশাপ নয়, আশির্বাদ হিসেবে গ্রহণ করি। এর ভালো দিকগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিজেরা সমৃদ্ধ ও সংশোধিত হই, জাতিকে সংশোধন করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা

৭ থেকে ১২ বছর বয়সী ছোটদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট
মূল্য: ১০০০ টাকা
সাইজ: ৭.৭৫*৮.৭৫"

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা' সিরিজ। গল্পে গল্পে সোনামণিরা এবার জেনে যাবে সুপথপ্রাপ্ত চার খলীফার বর্ণাঢ্য জীবনী, যারা ছিলেন এই উম্মাহর সেরাদের সেরা।

'আমার প্রথম পাঠাগার' সিরিজ

২ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট
মূল্য: ৯০০ টাকা
সাইজ: ৩.৫*৪"

এই সিরিজটি থেকে বাচ্চারা যেমন অ আ ক খ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়।

আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে জয়েন করুন আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ কিতাবিয়ান-এ!
লিংক- https://www.facebook.com/groups/kitabiyan

sondiponbd
www.sondipon.com
sondiponprokashon@gmail.com
01779 19 64 19 ,01406 300 100
34, Madrasa Market (1st Floor), Banglabazar

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

Monthly Al-Itisam الاعتصام 6th Year, 4th Part, February 2022, Price : 25.00

BONOJO

bonojobd.com
01704550806
/bonojobd

সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু

দেবহাটা, সাতক্ষীরা

অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন
bonojobd

চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

বের হয়েছে

ত্রৈমাসিক
কিশলয়
আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে

শিশু-কিশোরদের মেধা ও মনন বিকাশে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এক অনন্য কিশোর পত্রিকা

মূল্য মাত্র : ৫০ টাকা

পত্রিকা পেতে যোগাযোগ করুন
০১৪০৭-০২১৮৪১
kishaloy21@gamil.com
kishaloy.com